ঈমানের মেহনত : পরিচয় ও পদ্ধতি

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

গত ১৫/৩/২০১৮ ঈসায়ী মুহাম্মদপুরের শবগুযারী পয়েন্ট, কবরস্থান মসজিদে বাদ মাগরিব প্রদত্ত বয়ান।

হামদ ও সালাতের পর...
মুহতারাম হাযেরীন!
আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের জন্য চারটি জগত সৃষ্টি করেছেন–

এক. আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগত। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত রূহকে একত্র করা হয়েছিলো। তাদের সামনে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের রবুবিয়াত ও বড়ত্ব বয়ান করেছিলেন। নিজের বড়ত্ব বয়ান করার পর আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত রূহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন প্রতিটি রূহ একথা স্বীকার করেছিল যে, কেন হবেন না, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। স্বীকারোক্তির এ বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমের সূরা আ’রাফে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,) আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়, অবশ্যই আপনি আমাদের রব! আমরা সকলে (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি। (এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। (সূরা আ’রাফ-১৭২)

এ আয়াত ছাড়াও মুসনাদে আহমাদের ২৪৫৫ ও ২১২৩২ নং হাদীসে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এই যে আমরা আল্লাহর কাছে রূহের জগতে তার রবুবিয়তের কথা স্বীকার করে এসেছিলাম, দুনিয়াতে এসে তা বিস্মৃত হয়েছি, ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পুনরায় সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আসমান থেকে কিতাব নাযিল করেছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্ব আর রবুবিয়াতের ঐ কথাগুলোই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যুগে যুগে মানবজাতিকে শুনিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ও প্রস্থানের মাধ্যমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে। নবীদের অবর্তমানে আল্লাহর বড়ত্ব আর রবুবিয়াতের ঐ কথাগুলো এখন নায়েবে রাসূল, ওয়ারিসে আম্বিয়া উলামায়ে কেরাম আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। উলামায়ে কেরাম নায়েবে রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহরাবে নামায পড়াতেন, তিনি যে মিম্বরে বসে হেদায়াতের কথা বলতেন, কীভাবে জান্নাত পাওয়া যাবে, কীভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে তার তরীকা বাতলে দিতেন, উলামায়ে কেরাম সেই মেহরাব ও মিম্বরে বসে নবীজীর সেই কথাগুলোই আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। যাই হোক, বলছিলাম এক হলো আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগত।

দুই. দ্বিতীয় জগত হলো দুনিয়া। রূহের জগত থেকে আমরা মায়ের পেট হয়ে আরেকটা জগতে এসেছি। সেটা হলো দুনিয়ার জগত। অর্থাৎ আমরা বর্তমানে যেখানে আছি সেই জগত। দুনিয়া মূলত পরীক্ষার জগত। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আমরা এই জগতে থাকবো না। হাদীসে এসেছে, একদিন রাতের বেলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়ে বললেন-

فإن رأس مائة سنة منها، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد

অর্থ: তোমরা যারা আজকে এখানে আছো, একশত বছর পর তোমরা কেউ দুনিয়াতে থাকবে না। *(সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৫৬১৭)*

নবীজী এই কথাটি দশম হিজরীতে বলেছিলেন। ঠিক তা-ই হয়েছে। একশত দশ হিজরীর পর কোন সাহাবী দুনিয়াতে ছিলেন না। একশত দশ হিজরীতে সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবী হলেন আবূ তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা কিনানী রাযি.। (আল-ইস্তিআব লি-ইবনে আব্দিল বার ২/৭৯৮)

তিন. তৃতীয় জগত হলো বারযাখ। দুনিয়ার জগতের পরে আরেকটি জগত আসবে। সেটা হলো বারযাখের জগত। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জগত। অনেক উলামায়ে কেরাম এই জগতকে ওয়েটিং রুম বা প্রতীক্ষা কামরা বলেছেন। আপনি যদি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনে থাকেন তাহলে আপনার ওয়েটিং রুমটিও ফার্স্ট ক্লাস হবে। আর যদি সেকেন্ড ক্লাসের টিকেট কিনে থাকেন তাহলে আপনার ওয়েটিং রুমটিও সেকেন্ড ক্লাস হবে। বারযাখের জগতটির এক দিক দুনিয়ার সাথে মিলানো আর আরেক দিক আখেরাতের সাথে মিলানো। দুনিয়ার সাথে মিলানো এর প্রমাণ হলো, আমার কোন পরিচিতি ব্যক্তি যিনি বারযাখের জগতে

চলে গেছেন, আমি তার কবরে গিয়ে সালাম করলে সে শুনতে পাবে। আমি তার জন্য তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে আল্লাহ পাক তার কাছে এর সাওয়াব পৌঁছে দিবেন। সাওয়াব পেয়ে সে আমাকে চিনতে পারবে।

চার. চতুর্থ জগত হলো আখেরাত। বারযাখের জগত শেষ হলে আরেকটি জগত আসবে। সেই জগতের নাম আখেরাত। আখেরাতের জগত ফল ভোগ করার জগত। দুনিয়া পরীক্ষার জগত, কবর ওয়েটিং রুম আর আখেরাত হলো ফল ভোগ করার জগত। আমরা দুনিয়ার জগতে যে পরীক্ষা দিচ্ছি আখেরাতের জগতে তার ফলাফল ও প্রতিদান দেয়া হবে। কিয়ামতের ময়দানে এই ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কুরআনে কারীমের সূরা শূরার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

এভাবেই আমি তোমার উপর নাযিল করেছি আরবী কুরআন, যাতে তুমি সতর্ক কর কেন্দ্রীয় জনপদ (মক্কা) ও তার আশপাশের মানুষকে এবং সতর্ক কর সেই দিন সম্পর্কে, যে দিন সকলকে একত্র করা হবে, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল প্রজ্বলিত আগুনে।

যাই হোক, উলামায়ে কেরামের জবানে, হায়াতের এই চার স্তরের কথা আমরা বারবার শুনেছি। এটা বিশ্বাস করা জরুরী। এটা ঈমানের জরুরী অংশ। এর কোন একটা জগতকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। মুমিন হওয়ার জন্য ঈমানের সবগুলো কথা মানা এবং বিশ্বাস করা জরুরী। কিন্তু ঈমানহারা হওয়ার জন্য সবগুলো কথা অবিশ্বাস করা জরুরী নয়; কোন একটি কথা বা বিষয় অবিশ্বাস করলে বা সন্দেহ করলেই ঈমানহারা হয়ে যাবে, কাফেরের কাতারে চলে যাবে এবং ইসলামের সঙ্গে তার কোন সংশ্লিষ্টতা থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা রূহের জগত থেকে সরাসরি মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ আল্লাহ তা'আলা চান আমাদেরকে দিয়ে সরেজমিনে কাজ করিয়ে তারপর যার যার কাজ অনুযায়ী জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাবেন। এর হিকমত হলো, যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাউকে সরাসরি জান্নাতে বা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতেন তাহলে কাফেরদের আপত্তি করার একটা সুযোগ মিলে যেতো। তারা হয়তো বলতে পারতো, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে একবার দুনিয়াতে পাঠাতেন তাহলে আমরা ঈমান এনে অনেক বেশী দীনের কাজ করতাম। কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে রূহের জগত থেকে সরাসরি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কোন সুযোগই দেননি! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফের-মুশরিকদের এজাতীয় আপত্তি তোলার সুযোগ না রাখার জন্য সকলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ফলে এখন আর কেউ ঈমান না এনে, ঈমান-আমলের মেহনত না করে জাহান্নামী হলে আপত্তি করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের সূরা বনী ইসরাঈলের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(অর্থ:) (বলা হবে,) তুমি নিজ আমলনামা পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৪)

অর্থাৎ, কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা বান্দার বিচার করার আগে তাকে বলবেন, বান্দা! তুমি নিজেই নিজের বিচার করো আর দেখো, তুমি কোন প্রতিদানের উপযুক্ত, জান্নাতের না জাহান্নামের? আমলনামা দেখে বান্দা নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে আসলে কিসের উপযুক্ত।

মুহতারাম হাযেরীন! এজন্য সব সময় একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার এ জগতে আমাদেরকে পরীক্ষা নেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দু'টি পথ সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো শোকরগুজারীর পথ অর্থাৎ জান্নাতের পথ। আরেকটি হলো না-শোকরির পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে (মানুষকে) পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ। (সূরা দাহর-৩)

মানুষ জন্মের পর থেকে অনেক কিছু দেখে। এই দেখার কারণে তার কলবের মধ্যে ইয়াকীন পয়দা হয়। কলব হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। আর বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো কলবের প্রজা। কলবের মধ্যে যে কথার ইয়াকীন পয়দা হয় ঐ কথার উপর আমল করার জন্য কলব (রাজা) বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে (প্রজাদেরকে) হুকুম দেয়। উদাহরণত মানুষ দেখে, জমিন থেকে ফসল হয়। বড় চাকরিওয়ালা ২/৩ লাখ টাকা বেতন পায়। মিল-ফ্যাক্টরির মালিকগণ দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বেশি মালওয়ালা হলে বেশি সম্মান পাওয়া যায়, ইত্যাদি। তো এই দেখার উপর বিশ্বাস করেই মানুষ উদয়াস্ত কাজ-কর্ম করে, মেহনত করে করে ঘাম ঝরায়। কুরআনে কারীমের সূরা আলে ইমরানের ১৯৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে এই দেখা জিনিসের উপর ইয়াকীন করা থেকে সাবধান করেছেন যে, কাফেররা যে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে তা দেখে ধোঁকা খেয়ো না। কারণ এর মধ্যে কোন কামিয়াবী নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

(অর্থ:) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। (সূরা আলে ইমরান-১৯৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের কলবের ইয়াকীনকে সহীহ করার জন্য লক্ষাধিক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আমাদের উচিত, আমাদের কলবের মধ্যে দেখা জিনিসের যে ইয়াকীন আছে, আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত ও নবীদের দাওয়াত অনুযায়ী তা দূর করে আল্লাহ তা'আলা থেকে হওয়ার ইয়াকীন পয়দা করা।

কলব দ্বারা করণীয় বিষয়কে বলে ঈমান আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করণীয় বিষয়কে

বলে আমল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কলবের অনুগত। রাজা ঠিক হয়ে গেলে প্রজা সহজেই ঠিক হয়ে যায়। এজন্যই নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

অর্থাৎ তোমার শরীরে একটি গোশতের টুকরো আছে। এটি ঠিক হয়ে গেলে তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক হয়ে যাবে। মনে রেখো, ঐ গোশতের টুকরোটি হল কলব বা অন্তর। (আসসুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ১০৪০০)

সুতরাং কলব ঠিক করার জন্য মেহনত করতে হবে। কলব ঠিক হয়ে গেলে কঠিন থেকে কঠিন কাজ এমনকি সারা জীবনের অভ্যাসও সহজে ছেড়ে দেয়া যায়। উদাহরণত ইসলামে হুট করে প্রথমবারেই মদ নিষেধ করা হয়নি। এটা করা হয়েছে ২/৩ ধাপে। প্রথম ধাপগুলো ছিল কলবের প্রস্তুতিমূলক। অতঃপর যখন কলব ঠিক হয়ে গেলো তো 'নিষেধ' বলার সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরাম তা ছেড়ে দিয়েছেন। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক; হা.নং ৭১৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৩৩৭৬)

সুতরাং আমাদেরকে কলবের পেছনে মেহনত করে এই ইয়াকীন মজবুত করতে হবে যে, আমরা যা দেখি তা গলদ, ধোঁকা। আমাদের দেখা জিনিসের পেছনে একটা শক্তি কাজ করছে। সেই শক্তির নাম হলো, খালিক, মালিক, রব্ব, আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিভিন্ন আসবাবের মাধ্যমে নিজের শক্তিকে প্রকাশ করছেন মাত্র। আসল শক্তি তো একমাত্র আল্লাহর। যেমন আমি দেখি, পিয়ন আমাকে টাকা এনে দিচ্ছে। কিন্তু এই দেখাটাই কি আসল সত্য, না আমার প্রবাসী ছেলে পিয়নের মাধ্যমে আমাকে টাকা পাঠাচ্ছে? ঠিক তেমনি চাকরী, ব্যবসা, জমি-জিরাত এগুলো আল্লাহর পিয়ন। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই পিয়নদের মাধ্যমে আমাদের রিযিক পৌঁছাচ্ছেন। চাকরি চলে গেলে, ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা হতাশায় মুষড়ে পড়ি। না, হতাশ হওয়ার দরকার নেই; এক পিয়ন চলে গেছে তো কি হয়েছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিয়োজিত এমন হাজারো পিয়ন এখনো রয়ে গেছে; আল্লাহ অন্য পিয়নের মাধ্যমে আমার রিযিক পৌঁছাবেন, ইনশাআল্লাহ। হাদীসে এসেছে, আমাদের মৃত্যু আমাদেরকে যে পরিমাণ তালাশ করে, আমাদের রিযিক আমাদেরকে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে তালাশ করে। (শুআবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ১১৪৭)

এখন জানার বিষয় হলো, কলবের ইয়াকীন সহীহ করার তরীকা বা পদ্ধতি কী?

আল্লাহ পাক প্রতিটি জিনিস হাসিল করার একটা নেযাম বা তরীকা রেখেছেন। কেউ যদি চায় তার সন্তান নেককার হোক তাহলে তাকে নেককার মহিলা বিয়ে করতে হবে, নিজে নেককার হতে হবে। কেউ নিজে নেককার না হয়ে, নেককার মহিলা বিয়ে না করে নেক সন্তান আশা করলে এটা হবে মিথ্যে আশা। সব কাজেরই নিয়ম-নেযাম আছে। এক নেযাম দিয়ে আরেক কাজ নেয়া যায় না। ভাত বানানোর নেযাম দিয়ে মুড়ি বানানো যায় না। ঠিক তেমনি আল্লাহর পাক যাত থেকে হওয়ার ইয়াকীন সহীহ করার জন্য আল্লাহ একটা নেযাম রেখেছেন। সেটা হলো কলবের উপর মেহনত। আমরা যে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে মেহনত করছি, এটাও কলবের উপর মেহনত। আমরা এই মেহনত বাহ্যিকভাবে তো করবো আরেকজনের উপর কিন্তু নিয়ত থাকবে প্রথমে যেন নিজের কলব ঠিক হয়ে যায়, নিজের ঈমান-ইয়াকীন মজবুত হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় নিয়ত থাকবে, যে ভাইয়ের পেছনে মেহনত করা হচ্ছে তার কলবও যেন ঠিক হয়ে যায়।

আমাদেরকে গোটা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে সামনে রেখে মেহনত করতে হবে। সকলের হেদায়াতের জন্য মেহনত করতে হবে। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের তামান্না ছিল, তাঁর সকল উম্মত যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন– (অর্থ:) 'আপনি যদি ৭০ বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন, আমি (আল্লাহ) তাদেরকে মাফ করবো না।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আয়াতে বর্ণিত ৭০ যদি ৭০ সংখ্যা বোঝাতো, অর্থাৎ, ৭১ বার মাফ চাইলে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে মাফ করে দিতেন, তাহলে তাদের নাজাতের জন্য আমি ৭১তম বারও আল্লাহর কাছে মাফ চাইতাম। কিন্তু এই ৭০ তো সংখ্যা বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে আধিক্য। অর্থাৎ ৭০ কেন, যত হাজার বারই মাফ চাওয়া হোক, তাদেরকে মাফ করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৯৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৬৬)

বোঝা গেল, উম্মতের ব্যাপারে নবীজীর মনের আবেগ এই ছিল যে, হোক সে মুনাফিক-সর্দার, কিন্তু শেষতক আমারই তো উম্মত! সে জান্নাতে গেলে আমার ক্ষতি কী! মোটকথা, মুমিন, কাফের, মুনাফিক, মুশরিক সবাই রাসূলের উম্মত। এজন্য বিধর্মীদের হেদায়াতের ব্যাপারে আমাদেরকে ফিকির করতে হবে, যেন তারাও জান্নাতে যেতে পারে। তবে তাদের ব্যাপারে ফিকির করার দায়িত্ব দ্বিতীয় স্তরে। প্রথম স্তরে ফিকির করতে হবে নিজের ও অপরাপর মুসলমানের ব্যাপারে। আমার ঈমান কীভাবে শিরকমুক্ত হয়, আমার কলবের ইয়াকীন কীভাবে ঠিক হয়ে যায়–এই নিয়তে অন্যের পেছনে মেহনত করতে হবে। ফুটবল দেয়ালে ছুঁড়ে মারলে যেমন ছুঁড়ে দেয়া ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে ঠিক তেমনি আমরা অন্য ভাইয়ের কলবের পেছনে মেহনত করতে থাকবো, আর আল্লাহ আমার কলব ঠিক করে দিবেন। যার পেছনে মেহনত করছি সে হেদায়াত পাক না পাক, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করবেন, ইনশাআল্লাহ। হেদায়াত দানের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। কোন নবী রাসূলের হাতে হেদায়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। যদি হতো তাহলে নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে, লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী, ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের পিতা, আমাদের নবীজীর চাচা হেদায়াতবিমুখ হতেন না, গোমরাহ হতেন না। হ্যাঁ, নবী-রাসূলগণের যিম্মাদারী হেদায়াতের দিকে ডাকা, সত্যের প্রতি আহ্বান করা। কে সেই ডাকে সাড়া দিবে আর কে হক কবুল করবে এই ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর যিম্মায়।

দাওয়াতের লাইনে মেহনত করলে ঈমান মজবুত হয়। এমন মজবুত হয় যে, বিভিন্ন বালা-মুসীবতেও তার ঈমান নষ্ট হয় না। আমাদের কারো কারো ঈমান তো কচুপাতায় রাখা পানির মতো নড়বড়ে। একটু ব্যতিক্রম পরিস্থিতি হলেই ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। এক শ্রেণীর শয়তান আছে যাদের কাজই হলো মুমিনের ঈমান বিনষ্ট করা। সুতরাং শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সময় সময় আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেবেন। সামান্য একটা মাটির হাড়িও আমরা ১০ বার পরীক্ষা করে ক্রয় করি। একটা কাপড় কিনতে গেলে কত যাচাই বাছাই করতে থাকি। আর আল্লাহ আমাদেরকে তার পেয়ারা ও আপন করার আগে একটু দেখে নিবেন না, একটু বাজিয়ে দেখবেন না? অবশ্যই করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ দেখবেন, আমরা বিপদে পড়ে তাঁরই পথে থাকি, নাকি অন্য দিকে চলে যাই। দুনিয়াদাররা বিপদে পড়লে মন্ত্রীর কাছে ধর্ণা দেয়, ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। আর মুমিন কোন বিপদে পড়লে আল্লাহর দিকে দৌড়ায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

(অর্থ:) অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত-৩)

মোটকথা, আল্লাহ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেবেন। ঈমানের এই পরীক্ষায় পাশ করতে হলে দাওয়াতের লাইনে মেহনত করতে হবে। ঈমান বাড়ানোর যে মেহনত তা হলো দাওয়াতের লাইনে মেহনত। এর জন্য এটাই নেযাম। যত বড় আলেম হোক তাকেও ঈমানের মেহনত করতে হবে, আবার গরীব মজদুরকেও ঈমানের মেহনত করতে হবে। একজন শাইখুল হাদীস সাহেবও যদি ঈমানী মেহনত না করে তাহলে তার ঈমানী মৃত্যুর নিশ্চয়তা নেই। আবার অশিক্ষিত, গরীব দিনমজুর যদি ঈমানের মেহনত করে, তার ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাওয়ার নিশ্চয়তা আছে। নিজ নিজ সীমানা ও গণ্ডিতে সামর্থ্য অনুযায়ী এই মেহনতকে ফরযে আইন করা হয়েছে। আর সারা দুনিয়াবাসীর প্রতি দীনের দাওয়াত পৌঁছানো ফরযে কিফায়া করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলের আনীত দীনকে সারা দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনেক কুরবানী করেছেন। এই মেহনতের একটা অন্যতম দাবী হলো কুরবানী পেশ করা। আমাদেরকেও এই মেহনতকে সামনে রেখে কুরবানী পেশ করতে হবে। সাহাবীদের তুলনায় আমাদের কুরবানী তো কিছুই না। সাহাবায়ে কেরাম তো বিবি-বাচ্চা, ঘর-বাড়ি সব কিছুর কুরবানী করেছেন। পক্ষান্তরে আমাদেরকে তো সবকিছু ঠিক রেখে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে মাত্র চল্লিশ দিন, ৩ চিল্লা লাগাতে বলা হচ্ছে। আমাদেরকে নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক রেখে এই মেহনত করতে বলা হচ্ছে। সুতরাং এর জন্য আমরা সবাই খুশি খুশি তৈরী হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দীনের মেহনতের জন্য ভরপুর কবুল করুন, আমীন।

(২ পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়)

আর আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, আমাদের অধিকাংশই যেন গরু-ছাগল! কিছু দানা-পানির ব্যবস্থা করার জন্যই যেন আমাদের জীবন এবং জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ-ই আমাদের একমাত্র সাধনা। আমরা পৈত্রিক সূত্রে মুসলমান বটে, কিন্তু এর জন্য তো আমাদের শ্রম-ত্যাগ কিছুই লাগেনি। কাজেই এ ইসলাম থাকলেই কী আর গেলেই কী! নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানের ব্যথায় ব্যথিত না হয়ে আমরা যে মুসলিম জাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি– এটুকু চিন্তা করারও কি আমাদের প্রয়োজন নেই? কাফের-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি মন থেকে ঘৃণা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার শাক্তিও কি আমাদের নেই?

কাফের-মুশরিকদের এ সকল ঘৃণ্য ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমাদের নিজেদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা না থাকায় আজ আমরা শত্রু-মিত্রের পার্থক্যই বুঝি না। আমাদের মাঝে ঈমানী চেতনা না থাকার সুবাদে তারা উল্টো আমাদেরকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ পাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, আমাদের এ অসচেতনতা, অনুভূতিহীনতা ও নির্লিপ্ততার সুযোগে আমাদের ঘরানায়ই জন্ম নিচ্ছে কাফেরদের চেয়েও কঠিন শত্রুদল। এরা কাফেরদের যাবতীয় উগ্রবাদের সমর্থক ও সহায়ক; কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে। আরো মনে রাখতে হবে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যে গতি ও শক্তি নিয়ে উগ্রবাদের বিষাক্ত ছোবল আঘাত হানছে, নিজেদের মাঝে যথেষ্ট ঈমানী চেতনা, ত্যাগ ও কুরবানীর প্রস্তুতি না থাকলে ভেড়ার পালের খোয়াড়ে ঢোকার মত দলে দলে কাফের-নাস্তিকদের শিবিরে যোগ দিতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ভবিষ্যতে মানবসমাজ পাকা ঈমানদার আর প্রকাশ্য বেঈমান এ দু'টি শ্রেণীতেই বিভক্ত থাকবে। বর্তমানেও এমন একটি বৃহৎ শ্রেণী আছে যারা ঈমান ও কুফর দু'দিকেই তাল মিলিয়ে চলে কিংবা নিজের প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রেখে দু'দিক থেকেই ফায়দা লোটে। অদূর ভবিষ্যতে এরা নিজেদের ব্যাপারে ঈমানদার দাবী করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলবে। ফলে শ্রেণীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা খুব নগণ্য সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই সময় থাকতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কোন শ্রেণীতে থাকবো এবং সে অনুপাতেই কাজ শুরু করতে হবে। সময় ক্ষেপণের আর সুযোগ নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পড়া-লেখা ও লেখা-পড়াই ছাত্রদের কাজ

আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা.

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ ঈসায়ী রোজ বুধবার দিবাগত রাতে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার সহকারী মহাপরিচালক, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা. জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার তাশরীফ আনেন। পরদিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর জামি'আর শাখা জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার মসজিদুল আবরারে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি দিকনির্দেশনামূলক বয়ান পেশ করেন। হযরতের বয়ানের পূর্বে তার শুভাগমনে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও ঈমান রক্ষার আন্দোলনে হযরতের অগ্রণী ভূমিকা, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও গৌরবময় অতীত স্মৃতিচারণ করত জামি'আ রাহমানিয়ার মুরুব্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা তুলে ধরেন জামি'আর উস্তাদ মাওলানা শফীক সালমান। মাওলানা বলেন, হযরত বাবুনগরী দা.বা. একান্তই ইলমী ময়দানের মানুষ। সারাটি জীবন হাদীসের মসনদে তাসনীফ-তাদরীসে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন বাংলাদেশের নাস্তিক-মুরতাদদের আস্ফালন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের অবমাননাকারীরা রাজপথ দখল করে, তখন সময়ের প্রয়োজনে ঈমান ও ইসলাম হেফাযতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে তিনি হাদীসের মসনদ ছেড়ে রাজপথে নেমে আসেন। জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুরুব্বীদের দৃষ্টিভঙ্গিও এমন। এখানকার ছাত্র-শিক্ষক কেউ নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু ঈমান ও ইসলাম হেফাযতের স্বার্থে যদি অরাজনৈতিক ব্যানারে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সাময়িকভাবে জামি'আ রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষও অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকেন। মাওলানার এই সূচনা-বক্তব্যের সূত্র ধরে হযরত বাবুনগরী দা.বা. প্রথমে জামি'আয় আসতে পেরে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং জামি'আর মুরুব্বীগণের সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচিতি ও সুসম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ঐতিহ্য ও অবদানের কথা উল্লেখ করে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে মোবারকবাদ জানিয়ে বয়ান পেশ করেন। গুরুত্ব বিবেচনায় পাঠক সমীপে বয়ানটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

–সম্পাদক

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المتقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب قال رسول الله ﷺ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء رواه الامام ابن عبد البر الاندلسي في جامع بيان العلم وفضله

আলহামদুলিল্লাহ! দেশের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় এই প্রথম আল্লাহ তা'আলা আমাকে আসার তাওফীক দিয়েছেন। জামি'আর শোহরাত-সুখ্যাতি অনেক আগ থেকেই আমি শুনে আসছি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ইতোপূর্বে হয়নি। আজ আল্লাহর রহমতে এই দীনী ইদারা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হলো; এটা আল্লাহর বড় মেহেরবানী। রাতে আসতে আমার একটু বিলম্ব হয়েছে, শরীরটাও সুস্থ ছিল না। কিন্তু এখানে এসে জামি'আর সুযোগ্য ও প্রাজ্ঞ আসাতিযায়ে কেরামের মোলাকাত এবং ছাত্র ভাইদের সাক্ষাৎ পেয়ে অনেক খুশি হয়েছি। কিছুটা অসুস্থ হলেও আপনাদের এই মুবারক মজমা দেখে অনেকটা সুস্থবোধ করছি। হুকুম করা হয়েছে আপনাদের সামনে কিছু বলার জন্য। আমি আসতে না পারলেও জামি'আর প্রধান মুরুব্বী মুফতী মনসুরুল হক সাহেবের সাথে আগ থেকেই আমার সাক্ষাৎ আছে। জামি'আর মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের সাথে তো অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। আর আজ আপনাদের সাথে বসতে পেরেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মাশাআল্লাহ! আমার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানেরই একজন সুযোগ্য নবীন উস্তাদ মাওলানা শফীক সালমান সাহেব বেশ কিমতী কথা বলছিলেন; আমরা-আসলে পড়াশোনার মানুষ। মাদরাসা, মসজিদ, খানকার মানুষ। তাসনীফ-তা'লীকের মানুষ। কিন্তু কোন কোন সময় দীনের স্বার্থে ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর উদ্দেশ্যে দীনের দুশমনদের মোকাবেলা করার জন্য, নাস্তিক-মুরতাদ ও তাগুতের মোকাবেলা করার জন্য মসজিদ-মাদরাসা ও খানকা থেকে বের হয়ে রাজপথে নামতে হয়। যেমনটি সীরাতে সাহাবার অনুকরণে আমাদের আসলাফগণ করেছেন।

শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. ছিলেন দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস– বুখারী, তিরমিযীর উস্তাদ। কিন্তু সময়ের তাকাযায় তিনিও ইংরেজদের মোকাবেলায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জেলে গিয়েছেন। জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। একই রকম ঘটনা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর জীবনেও ঘটেছে। তিনিও দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস– বুখারী ও তিরমিযীর উস্তাদ। কিন্তু বৃটিশ বেনিয়াদের মোকাবেলায় ময়দানে নেমে এসেছেন। জেলে গিয়েছেন। নির্বাসিত হয়েছেন। এগুলো আমাদের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। মাশাআল্লাহ! জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার যিম্মাদার আসাতিযায়ে কেরামও সেই তরযে আমল অনুকরণ করেন। দীনী জরুরতে ঈমানী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তবে আমাদের আসল ও মৌলিক কাজ তো পড়াশোনা। এদেশের প্রায় সব মাদরাসাই এ নিয়মে চলছে এবং এটাই সঠিক কর্মপন্থা। নবীজীর হাদীস–

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
فبلسانه এর মধ্যে فبقلبه -ও আছে। মুসলিম শরীফের এই হাদীসের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দীনী আন্দোলনে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষত নবীপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে শাহবাগী নাস্তিক-মুরতাদদের মোকাবেলায় জানবাজি রেখে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন। আহতদের চিকিৎসার্থে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এসব কিছুর জন্য আমি আপনাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি। আপনারা জানে-মালে কাজ করেছেন; আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

আকাবিরে আসলাফদের তরীকা অনুযায়ী আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর তরীকা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের তরীকা অনুযায়ী শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানীর তরীকা অনুযায়ী আপনারা ঈমান রক্ষার এই আন্দোলনে জানে-মালে যে সহযোগিতা করেছেন; এটা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরচেয়েও বড় কথা হল, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করবেন। যাই হোক, এ সমস্ত কথা আজকে আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মাওলানার স্মৃতিচারণের কারণে আমি সে সম্পর্কে আপনাদের শুকরিয়া আদায়ের জন্য জাযাকুমুল্লাহ খাইরান বলার জন্যই কিছু আলোচনা করলাম।

আপনারা তালিবে ইলম। আমিও একজন তালিবে ইলম। আমি আপনাদেরই সফরসঙ্গী। তাছাড়া এই মজলিসে এখানকার বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আসাতিযায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন। সুতরাং আপনাদের মতো ইলমী মানুষদের সঙ্গে ইলম ভিন্ন অন্য আলোচনা মানানসই হবে না। শেখ সাদী রহ. বলেন,

ہر آں عاقل کہ بمجنوں نشیند

অর্থাৎ মজনুর জলসায় লায়লার আলোচনা ভিন্ন অন্য কিছু সমীচীন নয়। আপনারা ইলমের মজনু, ইলমের পাগল, ইলম পিপাসু। আপনাদের সাথে ইলম ছাড়া আর কোনো আলোচনা ভালো লাগবে না।

ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে আরয হল, আপনারা যে কাজে আছেন, কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিলের জন্য দিনরাত মেহনত করছেন– এটা সর্বোচ্চ কাজ; এর উপরে আর কোন কাজ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم

অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতারা আপনাদেরকে রাজি-খুশি করার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। তারা উড়তে উড়তে যখন কোন তালিবে ইলমকে দেখে, ওড়া থামিয়ে দেয়, সম্মানার্থে পাখা বিছিয়ে দেয়। উপলব্ধি করুন কত বড় সম্মান আপনাদের! মাসুম ফেরেশতারা আপনাদের সম্মান করছে!! কুরআন-হাদীসের কোথাও একথা নেই যে, প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে, মন্ত্রী-এমপিকে দেখলে ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেয়; কিন্তু আপনাদের কথা আছে। আমি আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, একজন মুখলিস তালিবে ইলমের মর্যাদা– হোক না সে গরীব-মিসকীন, হোক না তার জামা-কাপড় ছেঁড়া-ফাটা– নিঃসন্দেহে বড় বড় এমপি-মন্ত্রীদের চেয়েও বহুগুণ বেশি, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টের চেয়েও হাজারগুণ বেশি। তালিবে ইলমের এই সম্মান ও মর্যাদা কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানীই প্রকৃত সম্মানী। এই সম্মানই আখেরাতে কাজে আসবে, অন্যসব বেকার সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা, আল্লাহর নিকট আপনাদের অনেক ফযীলত, অনেক মর্যাদা। হাফেযে হাদীস ইবনে আব্দুল বার আন্দালুসী রহ. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي لروايته وحمله নামে একটি দারুন কিতাব লিখেছেন। তিনি এই কিতাবে একটা অধ্যায় এনেছেন باب تفضيل العلماء على الشهداء তথা শহীদগণের উপর উলামায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয় হাদীস শরীফে তাদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে,

اللون لون الدم والريح ريح المسك

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় জখম হয়ে শহীদ হয়েছে কেয়ামতের ময়দানে তাদের ঐ জখম তাজা হবে। সেখান থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। যা রক্তের ন্যায় লাল কিন্তু সুঘ্রাণ হবে মিশকের মতো। শহীদদের জন্য বেহেশত ওয়াজিব। আরো অনেক ফযীলত আছে।

তবে হাফেযে হাদীস আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. ঐ অধ্যায়ে প্রমাণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে শহীদের মর্তবা অনেক অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও উলামায়ে হক্কানীর মর্যাদা শহীদের চেয়ে বেশি। প্রমাণ হিসেবে তিনি এই হাদীস পেশ করেছেন–

قال رسول الله ﷺ يشفع يوم القيامه ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء

কিয়ামতের দিন বিশেষভাবে তিন প্রকারের মানুষ মুমিন মুসলিমদের জন্য সুপারিশ করবে। এক. নবীগণ, দুই. হক্কানী উলামায়ে কেরাম, তিন. শহীদগণ।

আরবী ব্যাকরণে ছুম্মা শব্দটি তারতীব বা সিরিয়াল বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, মুমিন-মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন নবীগণ। অতঃপর সুপারিশ করার সৌভাগ্য লাভ করবেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। অতঃপর শহীদগণ। এই ধারাবাহিকতা দ্বারা শহীদদের মর্তবার তুলনায় আলেমদের মর্তবা বেশিই বুঝে আসে।

সুতরাং যে ইলম হাসিল করার জন্য আপনারা রাত-দিন মেহনত করেছেন সেই ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝতে হবে। এটা বুঝে আসলে আরো বেশি পরিমাণ মেহনত করতে আগ্রহী হবেন। কোন জিনিসের দাম বুঝে না আসলে তার জন্য খুব বেশি মেহনত করা যায় না। আর বুঝে আসলে মেহনত বেশি করতে মন চায়। যে ইলমের জন্য আপনারা মেহনত করছেন তার ফযীলত বর্ণনায় হাফেয ইবনে আব্দুল বার রহ. উক্ত কিতাবে একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন,

لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الاحصاء

'যে সকল উলামায়ে কেরাম রাত-দিন ইলমের পিছনে মেহনত করছেন তাদের মর্যাদা-বুযুর্গী, মহত্ত্ব-প্রভাব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনেক বেশি। এছাড়াও তাদের রয়েছে এমন এমন ফযীলত যা গণনা করা যায় না।'

হে আমার তালিবে ইলম ভাইগণ! এরাই তো আপনারা। তিনি আরো লিখেছেন,

ومداد ما تجري به اقلامهم ازكى وافضل من دم الشهداء

‘উলামায়ে কেরাম যে কলম দিয়ে কুরআন-সুন্নাহর কথা লিখেন সেই কলমের কালির মর্যাদা শহীদের রক্তের চেয়েও বেশি।’

এটা কোন সাধারণ লোকের কথা নয়। একজন হাফেযে হাদীসের কথা। সবশেষে হাফেয ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন,

يا طالبي علم النبي مُحَمَّد *ما انتم وسواكم بسواء

‘হে নবী মুহাম্মাদের ইলমে নবুওয়াতের অন্বেষীগণ! আপনারা এবং অপরাপর মানুষ তো সমপাল্লার নন।’

বাস্তবিকই যাদের সীনায় সঞ্চিত রয়েছে নবুওয়াতী জ্ঞান, তারা তো কিছুতেই বঞ্চিতদের সমান হতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাও একথা বলেছেন,

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

‘যারা আহলে ইলম আর যারা আলেম নয়, তারা কখনো সমান হতে পারে না।’ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও রানী বিলকিসের ঘটনা সকলেরই জানা। দীর্ঘ ঘটনার শুধু শেষটুকু বলছি। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার সভাসদবৃন্দকে বললেন,

ايها الملاء ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين

রানী বিলকিস তার দলবলসহ আমার বশ্যতা স্বীকার করত অচিরেই আমার সাক্ষাতে আসছে। তারা এখানে পৌঁছার পূর্বেই ইয়ামানের সাবা দেশ থেকে আমার দরবারে এই সিরিয়ায় তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে তার সিংহাসন আমাকে এনে দিতে পারবে? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবার ছিল পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য এক দরবার। পূর্বাপর কখনোই এমন কোন দরবার ছিল না এবং হবেও না। একপাশে জিন, একপাশে মানুষ, উজির-নাজির, পশু-পাখি সবসহ বিশাল রাজদরবার। বিলকিসের সিংহাসনও ছিল বিশাল এক মহামূল্য সিংহাসন। হিরা মুক্তা আর জহরতের এত ভারী সিংহাসন দূর দেশ থেকে দ্রুততম সময়ে কে আনতে পারবে? সুলাইমান আলাইহিস সালাম তা জানতে চাইলেন। উত্তরে–

قال عفريت من الجن اني انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك

দরবারে উপস্থিত এক শক্তিশালী জিন দাঁড়িয়ে বলল, আমি আনতে পারব। কতক্ষণ লাগবে তোমার? সে বলল, আপনার মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বেই। কিন্তু–

وقال الذين عين وهو علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك

একজন আল্লাহর বান্দা ইনসান যার সীনার ভেতর কিতাবের ইলম ছিল– সে বলল, আপনার চোখের পলক পড়ার আগে আগেই আমি ওই বিশাল ভারী সিংহাসন দূরদেশ থেকে আপনার দরবারে এনে হাজির করবো।

আমার এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে দুই শক্তির মোকাবেলা। একটি বস্তুকেন্দ্রিক শক্তি, আরেকটি আধ্যাত্মিক শক্তি। জিনের শারীরিক শক্তি অনেক বেশি, তার সময় লাগবে দুই আড়াই ঘণ্টা। আর যে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, যার সীনায় আছে আসমানী ইলম, যদিও সে শারীরিক শক্তিতে দুর্বল, তথাপি তার সময় মাত্র চোখের পলক।

ছাত্র ভাইয়েরা! তাহলে আপনারা বুঝতে পারলেন, বস্তুকেন্দ্রিক শক্তি বড়, না ইলমের শক্তি বড়। নিঃসন্দেহে ইলমের শক্তি বড়। এটা এমন একটা শক্তি, যার সাথে পৃথিবীর কোন শক্তির তুলনাই হতে পারে না। সেই ইলম নিয়ে আপনারা নিমগ্ন আছেন। আল্লাহু আকবার! এটা আল্লাহর বড় মেহেরবানী।

হযরত আলী রাযি. বলেন,

رضينا قسمه الجبار فينا الانا علم و للاعداء مال فان المال يفنى على قريب وان العلم يبقى لا يزال

‘আমরা আল্লাহ তা‘আলার এই বণ্টন নীতিতে সন্তুষ্ট যে, তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আসমানী ইলম, আর দুশমনদেরকে দিয়েছেন দুনিয়ার ধন-সম্পদ। কেননা সম্পদ দ্রুত শেষ হয়ে যায়, আর আসমানী ইলম চিরস্থায়ী– কখনো নিঃশেষ হয় না।’

জ্বী হ্যাঁ, আমাদের চেয়ে কত উপযুক্ত মানুষ ইলমে নবুওয়াত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, এটা তার খাস মেহেরবানী, অনেক বড় নিয়ামত। তরীকত, মা’রেফত ও বেলায়েতের শাহেনশাহ, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ.-এ বিষয়ে বড় সুন্দর কথা বলেছেন,

جمله عالم صورت وجان ست علم خاتم ملک سلیمان ست

অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন, সমগ্র পৃথিবী একটা মরা দেহ। আর তার প্রাণ হলো আসমানী ইলম তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন মৃত ও বেকার। ঠিক তদ্রূপ এম.এ পাস করলে, ব্যারিস্টার হলে, মন্ত্রী-এমপি হলেও যদি ঐ আসমানী ইলম তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক না থাকে নিঃসন্দেহে তারা মুর্দা। কেননা তাদের রূহ নেই। আর যাদের সিনায় ইলম আছে তারাই জিন্দা।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন। জিন-ইনসান, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এমনকি বাতাস পর্যন্ত তার আয়ত্বে ছিল। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কথা তো তাদের স্ত্রী-পুত্ররাই শোনে না। তাহলে সুলাইমান আলাইহিস সালামের এই বিশাল ক্ষমতার রহস্য কী? মাওলানা আরেফে রুমী রহ. বলেন, এই ক্ষমতার রহস্য সৈন্যবাহিনী নয়, হাতিয়ার-কামান নয়; এই আজিমুশ্শান ক্ষমতার মূল রহস্য আসমানী ইলম।

কাজেই হে ছাত্র ভাইয়েরা! খুশি হয়ে যান। কিছু কষ্ট হলেও আপনাদের সীনায় সেই উলূমে নবুওয়াতের নূর রয়েছে। আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মাকাম-মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। যার মর্যাদা যত বড় তার দায়িত্বও তত বড়। উলামা-তলাবাদের কাঁধে কঠিন কঠিন জিম্মাদারী রয়েছে। এর জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে।

ছাত্র ভাইয়েরা! ছাত্রজীবনে আপনাদের কাজ হলো পড়ালেখা এবং লেখাপড়া। এটাই আপনাদের বড় রাজনীতি। এর জন্য যথেষ্ট মেহনত করতে হবে। আমাদের আকাবিরদের মেহনতের কথা শুনলে আশ্চর্য হবেন। ইমাম আবূ হাতেম রাযী রহ. বড় মুহাদ্দিস ছিলেন।

হাদীস শেখার জন্য পায়ে হেঁটে সফর করেছেন নয় হাজার মাইল! ইমাম বুখারী রহ. ইলমে হাদীস হাসিল করার জন্য বোখারা থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত দেশ সফর করেছেন। সফর করতে করতে তার টাকা-পয়সা শেষ। খাবার নেই। পেট খালি। পকেটও খালি। আহা! তখন তিনি গাছের পাতা, জমিনের ঘাস খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তারপরেও ইলমের মেহনত ছাড়েননি। আমার মরহুম আব্বাজান (মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানযীমুল আশতাতের রচয়িতা) আল্লামা আবুল হাসান বাবুনগরী রহ. দেওবন্দের ছাত্রজীবনে দিন-রাতে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমাতেন। আবার ঘুমানোর সময় বালিশের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করতেন। ঘুমের চাপ বেশি না হওয়ার জন্য তিনি এরূপ করতেন। ইলমের জন্য আমাদের আকাবিরদের বিস্ময়কর এমন অনেক ঘটনা রয়েছে। মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া রহ. বলেছেন,

لا يستطاع العلم براحة الجسم

বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশের মাধ্যমে ইলম আসে না। তাই কষ্ট করতে হবে। আবার শুধু মেহনত করলেই হবে না, তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। মেহনতের মোটামুটি তরীকা এই–

এক. সামনের সবক দেখে আসা।

দুই. সবকে নিয়মিত হাজির থাকা। কোন অবস্থাতেই যেন দরস ছুটে না যায় এবং উস্তাদের তাকরীর-আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনা। দরসের সময় হাশিয়া, বাইনাস সাতরাইন, শরাহ-শুরুহাত দেখা যাবে না; আগে পরে দেখতে হবে।

তিন. দরস শেষে তাকরার করা। এর দ্বারা অনেক ফায়দা। কিন্তু আফসোস! আজ তাকরার উঠে গেছে।

চার. তাকরারের পর সবকের সারসংক্ষেপ-বিষয়বস্তু মুখস্থ করে নেয়া। এই কয়েকটি কাজ যদি যথাযথ করতে পারেন তাহলে কঠিন কঠিন কিতাবও হল হয়ে যাবে, বুঝে আসবে। এটা হল ছাত্রদের মেহনতের পদ্ধতি। আবার পড়ার সাথে সাথে লেখাও ঠিক করতে হবে। পড়ালেখা-লেখাপড়া। সর্বপ্রথম যে পাঁচটি আয়াত হেরা গুহায় নাযিল হয়েছিল, সেখানে পড়ার কথা আছে, লেখার কথাও আছে। বর্তমানে মিডিয়ার যুগ। তাই লেখা শিখতে হবে। আরবী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হতে হবে। আরবী কুরআন-হাদীসের ভাষা। তাই সরাসরি আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বাংলা অনুবাদ দেখে বিজ্ঞ আলেম হওয়া যায় না। বেশি থেকে বেশি গতানুগতিক মৌলবী হওয়া যায়। তাই আরবী ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরপর মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা শিখতে হবে। উর্দূ-ফার্সিকেও একেবারে বাদ দেয়া যাবে না। এখনো অনেক উলূমে শরীয়া উর্দূ-ফার্সিতে রয়ে গেছে। আকাবিরে দেওবন্দ উর্দূ ভাষায় কিতাব লিখেছেন। আর ইলমে তাসাওউফ, তরীকত ও সুলূকের বড় অংশ এখনও ফার্সি ভাষায় রয়ে গেছে। মসনবী শরীফ ফার্সি ভাষায়। তাই উর্দূ-ফার্সি বাদ দেয়া যাবে না। তবে প্রাধান্য দিতে হবে আরবীকে।

সেই সঙ্গে আসাতিযায়ে কেরামের ইহতিরাম করবেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে সম্মান করবেন। ইলমে নবুওয়াত হাসিল করার জন্য উস্তাদের সম্মান অত্যন্ত জরুরী। দীনী কিতাবাদির ইহতিরাম করবেন। খবরদার! খবরদার!! উযূ ছাড়া কোন দীনী কিতাব স্পর্শ করবেন না। এমনকি পারতপক্ষে নাহব-সরফের কিতাবও বে-উযূ ধরবেন না। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. মাত্র সাত বছর বয়স থেকে বে-উযূ কোন দীনী কিতাব স্পর্শ করেননি। মাদরাসার কানুন মেনে চলবেন। এভাবে যদি চলতে পারেন তাহলে–

عدالت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے

کام دنیا کی امامت کا

আজকে আপনারা যারা ছাত্র। কালকে দীনের সকল ক্ষেত্রে হবেন ইনশাআল্লাহ জাতির রাহবার। জাতি আজ আপনাদের অপেক্ষায়। আপনারা হক্কানী-রব্বানী আলেম হয়ে তাকওয়া ও ইলমের হাতিয়ার নিয়ে যখন কাজের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তখন এই তৃষ্ণার্ত জাতির পিপাসা নিবারণ করতে পারবেন। আকাবিরগণ আর আসবেন না; আপনারাই হবেন এ যুগের শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, কাসেম নানুতবী, রশীদ আহমদ গঙ্গুহী, থানবী, কাশ্মীরী, হাফেজ্জী, শামসুল হক ফরিদপুরী। সুতরাং প্রচণ্ড রকম মনোবল ও হিম্মত নিয়ে মেহনত করতে হবে। আলেমের মত আলেম হতে পারলে সব জায়গায় দাম আছে, কদর আছে।

ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে সামান্য যা কিছু বললাম, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। শুরুতেই বলেছি, আমিও আপনাদের মতে একজন ছাত্র। নিজেকে সব সময় ছাত্র মনে করি। আমার চতুর্পাশে এখানকার আসাতিযায়ে কেরাম বসে আছেন। বড় বড় উলামা হাযারাত বসে আছেন। বিশেষ করে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব। তাদের সাথে বসতে পেরে আমার অনেক বেশি খুশি লাগছে। এখানে আমি এই প্রথম আসলাম। জামি'আর যে মানযার, জাহেরী-বাতেনী তারাক্কী ও উন্নতি– আল্লাহ তা'আলা তা আরো উন্নীত করুন এবং মাকবুল ইদারা হিসেবে কবুল করে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখুন। আমি মনে করি, এ সকল জাহেরী-বাতেনী উন্নতি এই প্রতিষ্ঠানের আসাতিযায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের মত তৎপর আলেমে দীনের সোহবত ও দু'আর ফলাফল। সবচেয়ে বড় কথা হল, আল্লাহর রহমত। আল্লাহর রহমতেই সবকিছু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি তাওফীক দান করুন। জামি'আর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন। গায়েবী খাযানা থেকে যাবতীয় জরুরত পুরা করে দিন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

শ্রুতিলিখন : মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী
শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব, শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা

বাবরি মসজিদের রায় এবং কিছু প্রশ্ন

জি. মুনীর

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের গত ৯ নভেম্বর ২০১৯-এর একটি রায়ে বলা হয়েছে– বাবরি মসজিদের ২ দশমিক ৭ একর জমি হিন্দুদের দেয়া হবে রামমন্দির নির্মাণের জন্য। আর অযোধ্যায় বিকল্প কোনো স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের দেয়া হবে ৫ একর জমি। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে শুধু সঙ্ঘ পরিবার তা কিন্তু নয়। বরং স্বাগত জানিয়েছে দেশটির অনেক সেক্যুলার রাজনৈতিক দলও। এসব দলের মধ্যে রয়েছে- কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও তেলেগু দেশম পার্টি। বলা হচ্ছে, এই রায়ের মাধ্যমে বাবরি মসজিদ নামের বিতর্কটির একটি চূড়ান্ত সমাধান টানা হলো।

কিন্তু এই রায়ের মাধ্যমে সমস্যাটির কোনো বাস্তব সমাধান তো টানা হয়ইনি, বরং এই রায় নানা উদ্বেগজনক প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে। রায়টি নিয়ে ভারতের ও ভারতের বাইরের গণমাধ্যমে চলছে নানাধর্মী আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক। অনেক বিবেকবানই বলছেন, এটি এমন একটি রায় যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। এটি ইতিহাসে ঠাঁই পাবে নিছক একটি রায় হিসেবেই, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনো উদাহরণ হিসেবে নয়। অনেকেই বলছেন, এ রায়ে 'প্রিন্সিপল অব ফেয়ারনেস' অর্থাৎ 'ন্যায্যতার নীতি' বিসর্জন দেয়া হয়েছে। এ রায়ে ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভিত্তিহীন বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলেছে। অথচ ইতিহাস নির্মাণের দায়িত্ব, কিংবা মহল বিশেষের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার কোনো দায়িত্ব আদালতের নয়। আমরা সবাই জানি, বিতর্কিত ২ দশমিক ৭ একর স্থানটিতে বাবরি মসজিদ দাঁড়িয়ে ছিল সেই ১৫২৮ সাল থেকে। এরপর ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী মসজিদটিতে দল বেঁধে মিছিল করে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। সেই মসজিদের পুরো জায়গাটিই এখন সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে দিলেন রামমন্দির নির্মাণের জন্য।

বাবরি মসজিদ নিয়ে মামলাটি বহু দিনের পুরনো। এই মামলার সূচনা ১৩৪ বছর আগে। এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একটি রায় দিয়েছিলেন। রায়ে এই বেঞ্চ বলেছিলেন, বাবরি মসজিদের সাইটটি বিভক্ত করা হবে তিনটি অংশে : দু'টি অংশ যাবে হিন্দুদের পক্ষে, আর একটি অংশ যাবে মুসলমানদের পক্ষে। সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা এই মামলার চূড়ান্ত রায়ই সম্প্রতি দেয়া হলো, যে রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বেঞ্চের রায়ের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। এ লেখার পরবর্তী অংশে এই রায় যেসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, তারই ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

প্রথমেই পাঠকদের জানাতে চাই, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এ রায় সম্পর্কে কী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন, 'এই রায়ে আমি কিছুটা ডিস্টার্বড অনুভব করি। যখন আমরা আমাদের সংবিধান পেলাম, তখন আমরা এই মসজিদের বাস্তব অস্তিত্ব দেখেছি। এই মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া সম্পর্কিত রায়ে পূর্ববর্তী আদালত বলেছিলেন, সেখানে ৫০০ বছরের পুরনো একটি প্রার্থনালয় ছিল। আর সেটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'যখন আমরা সংবিধান পেলাম, তখন আইনের বদল হয়। আমরা স্বীকৃতি জানালাম ধর্মের স্বাধীনতা, ধর্মানুশীলন ও ধর্ম প্রচারের মৌলিক অধিকারের প্রতি। এই মৌলিক অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে আমার অধিকার রয়েছে প্রার্থনালয় সুরক্ষা করার। যেদিন এই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলো, সেদিন এই মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হলো।' বিচারপতির এ কথার মাঝে স্পষ্ট আভাস মেলে, এই রায়ে ভারতীয় সংবিধান সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ, এই সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে। স্পষ্টত এই রায়ে সে স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি 'ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট দ্যাট চেঞ্জড ইন্ডিয়া' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বইও লিখেছেন। অভিজ্ঞ এই বিচারপতি পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এই রায় ঘোষণা করলেন যে, এই বিতর্কিত ভূমির মালিক রামলালা?

তিনি বিচারপতিদের উদ্দেশে আরো বলেন, 'আপনারা রায়ে বলেছেন, মসজিদের নিচে একটি কাঠামো ছিল; কিন্তু আপনারা বলেননি যে– এই কাঠামো মন্দিরের, মন্দির ভেঙে এর ধ্বংসস্তূপের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বরং বলেছেন, মসজিদের নিচে পাওয়া কাঠামো মন্দিরের ছিল এমন প্রমাণ নেই। তাছাড়া প্রশ্ন হচ্ছে, ৫০০ বছর পর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে আদালত কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে?'

তিনি উল্লেখ করেন, 'যদি এটি মেনে নেয়া হয়ে থাকে, এই জায়গায় মুসলমানেরা নামাজ আদায় করত, তবে এই জায়গাকে মসজিদ বিবেচনা করতে হবে। অতএব এটিকে একটি মসজিদ ধরে নিয়ে, যেটি দাঁড়িয়েছিল ৫০০ বছর ধরে, আপনারা কী করে এর মালিকানার সিদ্ধান্ত নেবেন?

কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনারা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন? আদালতে যারা এসেছেন, তারা যেসব দলিলপত্র এনেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এর মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করতে পারেন। প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মালিকানা স্বত্বের সিদ্ধান্ত আদালত নিতে পারেন না।'

এই রায়ের একটি বড় ধরনের দ্বান্দ্বিক দিক হচ্ছে, কোর্ট রুল দিয়েছেন মুসলমানেরা এটুকু প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে যে, তারা ১৫২৮ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মসজিদটি একান্তভাবেই তাদের দখলে ছিল এবং তারা তাতে নামাজ পড়ত। এর পরও কোর্টের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে– হিন্দুপক্ষও এটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে, একান্তভাবে এ স্থানটি হিন্দুদের দখলে ছিল। কিন্তু, কোথাও হিন্দুপক্ষকে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়নি এই স্থানটির ব্যাপারে হিন্দুদের একান্ত দখলিস্বত্ব প্রমাণের জন্য। হিন্দুরা প্রার্থনা করত রামবেদীতে, যা গম্বুজওয়ালা কাঠামোর বাইরে। তা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পরিব্রাজক জোসেফ টিফেনথেরারের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হিন্দুদের রামবেদীতে প্রার্থনা করার বিষয়টি। কিন্তু হিন্দুদের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা করার পক্ষে যুক্তি প্রমাণের জন্য এটি একটি নিশ্চিত প্রমাণ নিশ্চয়ই নয়। যেখানে আদালত বলছেন, উভয়পক্ষই বাবরি মসজিদের এই বিতর্কিত স্থানের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে রায়ে এই জমি হিন্দুপক্ষকে আদালত কী করে কিসের ভিত্তিতে দিয়ে দিতে পারেন? কী করে এই রায়ের মাধ্যমে পুরো বিতর্কিত জমির ওপর হিন্দুদের মালিকানাস্বত্ব ঘোষিত হতে পারে? এদিকে এই রায়ের পর এমন একটি জনধারণা ভারতীয় জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, এই রায়ে মেজরিটিয়ানদের সাথে আপস করা হয়েছে। এই রায়ে মেজরিটিয়ানদের একটি কালো ছায়ার আছর রয়েছে। রয়েছে বিচারকদের ওপর হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রভাবও, যারা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে একটি হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর প্রয়াসে প্রয়াসী। আর কথাটি এরা এখন কোনো রাখঢাক না রেখে খোলাখুলিই বলছে। আলোচ্য এই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট এর পর্যবেক্ষণে বলেছেন, হিন্দুত্ববাদীদের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজটি ছিল একটি আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু রায়ে কার্যত সুপ্রিম কোর্ট এই আইনবিরোধী কাজটিকেই বৈধতা দিলেন দু'টি উপায়ে- প্রথমত, এই মসজিদ যারা আইন লঙ্ঘন করে ধ্বংস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি ঘোষণা করা হয়নি এই রায়ে। দ্বিতীয়ত, যে হিন্দুপক্ষ আইন ভঙ্গ করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল, তাদের ইচ্ছা অনুসারেই বাবরি মসজিদের স্থান হিন্দুদের মন্দিরের জন্য দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কার্যত আদালত আইন লঙ্ঘনকারীদেরই পুরস্কৃত করলেন। প্রশ্ন উঠেছে– আদালত এই সিদ্ধান্তটি নিলেন কিসের ভিত্তিতে? এর কী জবাব আছে, সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারকদের কাছে? আসলে আদালতের এই সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে এই রায়কে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

এই রায় প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে– এই রায়ের ৭৯৮ নম্বর অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে আদালত উল্লেখ করেছেন- '১৯৪৯ সালে ২২-২৩ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে মুসলমানদের প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত করে মসজিদটি দখলে নিয়ে সেখানে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপন করে মসজিদটি অপবিত্র করা হয়েছে। মুসলমানদের এই বের করে দেয়ার কাজটি কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ করেনি। কিন্তু এটি ছিল এমন একটি কাজ, যার মাধ্যমে তাদের প্রার্থনার স্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ... ভ্রান্তভাবে মুসলমানদের মসজিদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, আর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ৪৫০ বছর আগে।'

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে একদল উগ্রপন্থী করসেবক, যারা সেখানে গিয়েছিল মসজিদটির স্থানে একটি অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করতে। তখন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ভারতে একটি বড় ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুই হাজারের মতো মানুষ মারা যায়। যার ৯৫ শতাংশই মুসলমান। এখন বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বেঞ্চ বলছেন ৬ ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদে পরিচালিত ভ্যান্ডালিজম তথা নির্বিচার ধ্বংসোন্মাদনা ছিল অবৈধ তথা আইনবিরোধী। অথচ এই রায়ে এর জন্য দায়ীদেরই পুরস্কৃত করা হলো। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এ ব্যাপারে ভারতীয় আদালত কি আইন অনুযায়ী চলবে, না মেজরিটিয়ানদের সাথে আপস করেই চলবে কিংবা বিশ্বাসবাদকেই প্রাধান্য দেবে? সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, আদালত পুরোপুরি আইনের পথেই হাঁটুক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফৌজদারি ষড়যন্ত্র মামলা এখনো চলমান ভারতীয় আদালতে। আসামি এল কে আদভানি ও আরো অনেকে। এ সম্পর্কিত আদেশ এখনো আলোর মুখ দেখেনি। সুপ্রিম কোর্ট যদি মনে করেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজটি ছিল বেআইনি, তবে এর জন্য দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করার একটি দায় আছে সে আদালতের। বাবরি মসজিদের স্থানের মালিকানা প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় সম্প্রতি ঘোষণা করলেন, এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে, ভারতের শীর্ষ আদালত কি পারবেন সে দায় নিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের শাস্তি দিতে? সে প্রশ্নটিও এখন বড় হয়ে দেখা দিলো।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দায় এড়াতে পারেন না কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। তিনি বাবরি মসজিদ রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্থানটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তা রক্ষা করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। অথচ বাবরি মসজিদটি একটি উপাসনালয় হওয়ায় তার সরকারের

সাংবিধানিক দায়িত্ব ছিল তা রক্ষা করার। তিনি পারতেন এই স্থানটিকে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণা করতে। রাজিব গান্ধীও সমভাবে দায়ী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ব্যাপারে। তিনিই মসজিদের ভেতর মূর্তি রাখার অনুমোদন দিয়েছিলেন। মাধব গোদবলি একজন স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর রাজিব গান্ধীকে অভিহিত করেছিলেন একজন 'মোস্ট প্রমিন্যান্ট করসেবক' হিসেবে। তিনি বলেন, 'রাজিব গান্ধী সব সময় হিন্দু ও মুসলমান মৌলবাদীদের খুশি করে চলতেন। তাই সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী এই সময়টায় রাজিব গান্ধীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় বিভিন্ন মহলে।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দত্ববাদীরা ধ্বংস করে দেয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে অস্তিত্বশীল ছিল। এটি নিশ্চিত, সেটি নির্মিত হয়েছিল ১৫২৮ সালে। এর পরবর্তী সময়ে লর্ড রামের কাহিনী নিয়ে 'রামায়ণ' রচনা করেন তুলসি দাস। তুলসি কিন্তু লেখেননি এই বাবরি মসজিদটি যে স্থানটিতে ছিল, সে স্থানটিই ছিল রামের জন্মভূমি। হিন্দুইজমের আইকন হিসেবে বিবেচিত স্বামী বিবেকানন্দও একথা উল্লেখ করেননি। বিভিন্ন জরিপও এমনটি নির্দেশ করেনি কিংবা উল্লেখ করেনি– গত ৫০০ বছরে কোনো হিন্দু সমাজের কোনো ব্যক্তিত্বের কাহিনী বিতর্কিত স্থানটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দল খুঁজে পেল, বাবরি মসজিদ বিতর্ক রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনের ভালো অনুষঙ্গ হতে পারে। এই প্রশ্ন এখন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরাই তুলছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরপর। তারা বলছেন– "বাবরি মসজিদ নির্মিত হলো ১৫২৮ সালে। তখন তুলসি দাসের বয়স ছিল ১৭ বছর। তার জন্ম অযোধ্যায় ও বেড়ে ওঠেন এখানেই। আমরা যে মহাকাব্য রামায়ণকে শ্রদ্ধা করি, তাতে এই মসজিদের স্থানটিতে রামের জন্ম হয়েছে, সে কথার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ আদভানি যখন রাজনৈতিক দল 'জনসংঘে'র বড় মাপের নেতা, তখন তিনি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দলবল নিয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে বাবরি মসজিদ ভেফু দ্বারা গুঁড়িয়ে দেন এটিকে রামের জন্মভূমি দাবি করে। দাবি করা হলো– বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর। এই জনসংঘই হচ্ছে বিজেপির সাবেক নাম। বিজেপি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যেই বাবরি মসজিদের স্থানটি রামের জন্মভূমি এবং এখানে একটি মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হয়েছে বাবরি মসজিদ– এই মিথ্যা দাবি তুলে মসজিদটি ভাঙার মতো দৃষ্টতা দেখাল।"

বলা হচ্ছে, এই রায় দীর্ঘ দিনের একটি বিরোধের নিস্পত্তি করল। আসলে কি তাই? সে প্রশ্নও আজ আলোচিত হচ্ছে ভারতজুড়ে। এই রায় ভবিষ্যতে ভারতের আরো অনেক মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম স্থাপনার বিরোধকে উসকে দেবে। দেশটিতে মসজিদগুলো সংরক্ষিত 'প্লেসেস অব ওয়ারশিপ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্টের আওতায়। এই আইনে বলা আছে– ধর্মীয় স্থানগুলো সেভাবেই থেকে যাবে, ঠিক যেভাবে ছিল ভারতের স্বাধীনতার দিনটিতে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে। এই আইনটি প্রণীত হয় ১৯৯১ সালে, যখন রামজন্মভূমি বিরোধটি চরমে পৌঁছে; কিন্তু এই আইনটির আওতায় আনা হয়নি বাবরি মসজিদ নিয়ে বিরোধের বিষয়টি। ভারতে ধর্মীয় কাঠামোর পবিত্রতা রক্ষায় আইনি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। বাবরি মসজিদ এর প্রমাণ।

ভারতের অন্যতম বড় মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'র ইন্টারন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট আচার্য গিরিরাজ কিশোর ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বেঞ্চের দেয়া রায়ের পর বলেছিলেন, বাবরি মসজিদের রায় হিন্দুদের আরো পবিত্র স্থান মুসলমানদের দখল থেকে মুক্ত করার পথ খুলে দিলো।' তখন তিনি আরো বলেন, 'ভারতীয় মুসলমানদের এখন প্রস্তুতি নিতে হবে মথুরা ও বারানসির দু'টি মসজিদ আমাদের কাছে ফেরত দিতে, যেখানে এর আগে মন্দির ছিল।'

আসলে তিনি বলছিলেন বারানসির জ্ঞানবাপি মসজিদ ও মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদের কথা। উগ্র হিন্দু গোষ্ঠীগুলো বলছে– মথুরার মসজিদের স্থানটিতে দেবতা কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এবং সেখানে একটি মন্দির ছিল। এদের বিশ্বাসনির্ভর আরো দাবি হচ্ছে– মুসলমানদের শাসনামলে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে তারা এমন ২৯৯টি মসজিদের তালিকা তৈরি করেছে।

এখন এরা যদি এসব ব্যাপারে নিম্ন আদালতে মামলায় যায়, তবে এসব আদালত সুপ্রিম কোর্টের নজির উল্লেখ করে সেসব মসজিদও হিন্দুদের দিয়ে দিলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা এই মুহূর্তে আন্দাজ-অনুমান খুবই মুশকিল। শুধু তাই নয়, তাজমহলও নাকি ছিল মন্দির, সেটিও এখন হিন্দুদের দিয়ে দিতে হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। আসলে এসব ব্যাপারে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে তোলার ফ্লাডগেটটিই খুলে দিলো সুপ্রিম কোর্টের রায়। এর অর্থ ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের একটি নিয়ামক হয়ে কাজ করতে পারে এই রায়। অনেকেই বলছেন, এই পরিস্থিতিতে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের উচিত হবে না কোর্টের নির্দেশিত বিকল্প ৫ একর জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা।

(দৈনিক নয়াদিগন্ত-এর সৌজন্যে)

তাবলীগ, এতায়াত ও উলামায়ে কেরাম

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

নেক আমল যদি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে সেটা হয় বান্দার জন্য নাজাতের কারণ। আর যদি রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য হয় কিংবা দুনিয়াতে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য হয়, তাহলে সেটা হবে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত। আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য অনেক বড় একটা আমল। কিন্তু এই কাজ তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন রিয়ামুক্তভাবে করা হবে এবং দুনিয়ার কারো নিকট এর কোন বিনিময় প্রত্যাশা করা হবে না। এই মেহনত যখন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হবে এবং নিজের ঈমান-আমলের ইসলাহের জন্য হবে, তখন এই মেহনত মেহনতকারীর জীবনে রং আনবে। রং আসার অর্থ হলো, তার অহংকার দূর হবে, আমলগুলো সুন্নাত মোতাবেক হবে, তার মধ্যে বিনয় আসবে, আলেম-উলামাদের সঙ্গে মহব্বত পয়দা হবে।

বর্তমান যুগের প্রচলিত তাবলীগের মেহনতও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত। নিজের ঈমান দুরস্ত করার জন্য উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে এই মেহনতে লেগে থাকা খুবই জরুরী। বাংলাদেশে অবস্থান করে এটা আমাদের পুরোপুরি বুঝে নাও আসতে পারে। কিন্তু কোন অমুসলিম দেশে গেলে বিষয়টা ঠিকই বুঝে আসবে। গত ১৪ আগস্ট ২০১৯ থেকে ২৬ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত আমি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সফর করে এসেছি। গুজরাট, সূরাট, আহমেদাবাদ, জুনাগড়, রাজকোল, সোমনাথ, পোরবন্দরসহ বিভিন্ন জায়গায় সফরের সুযোগ হয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ।

এই সফরে আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে– যারা তাবলীগের মেহনতের সাথে লেগে থাকে তাদের পক্ষে সঠিক ঈমান-আকীদা আর আমলের উপর থাকা সম্ভব হচ্ছে। যেসব মহিলা মাস্তুরাতের মেহনতে জুড়ে আছে তাদের মধ্যে সামান্য পর্দা-পুশিদা আছে। এর বাইরে অধিকাংশ মুসলমান সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তা'লীম, তাবলীগ এবং তাযকিয়া। তার ইন্তিকালের পরে উলামায়ে কেরাম এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এজন্যই উলামায়ে কেরামকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলা হয়েছে এবং সমস্ত উম্মতের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। উলামায়ে কেরামের এই মেহনতের সাথে উম্মতের একটা দল জুড়ে থেকে নিজেদের ঈমান-আমল ঠিক করার সুযোগ পেয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারাও এই মেহনতের মাধ্যমে অন্যের নিকট দীন পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছে। এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের বড় একটা তবকা রয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ। যতদিন পর্যন্ত তারা উসূলের সাথে এই কাজে জুড়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে।

কিন্তু কখনো যদি তাদের মধ্যে এই মনোভাব চলে আসে যে, তাবলীগ তো আমরাই করছি। আলেমরা তাবলীগ থেকে অনেক দূরে, তারা তো শুধু মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে পড়ে থাকে, সময় লাগায় না, চিল্লায় যায় না। তাদের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরাই আসল দাঈ; তাহলে কিন্তু এই তাবলীগই তাদের জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে। এধরনের ধারণামিশ্রিত মেহনত তাদের পদস্খলনের কারণ হবে।

আপনি তাবলীগ করছেন ঠিক আছে, চিল্লা দিচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে আপনি তো অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারেন না, বিশেষ করে আলেমদের সমালোচনা করার কোনো অধিকারই তো আপনার নেই।

আমাদের বাংলাদেশে ২০১৭ সালে এতায়াতী ফিতনা মাথাচাড়া দেয়ার পরে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ যারা দু-একটা চিল্লা দিয়ে টুপি-দাড়িওয়ালা হয়েছে তারা উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করে নিজের ঈমান-আমলের বিরাট ক্ষতি করে ফেলছে।

আসলে তাবলীগ কাকে বলে সেই জিনিসটাই তারা জানে না। তারা মনে করে মাসে তিনদিন, বছরে একটা চিল্লা দিলাম, আর দৈনন্দিন কিছুটা সময় অলি-গলিতে কাটালাম– আমি হয়ে গেলাম দীনের দাঈ, তাবলীগওয়ালা, উম্মতকে নিয়ে ফিকির করনেওয়ালা।

অথচ উলামায়ে কেরাম এই মাদরাসায় বসেই সারাদেশের ফিকির করছেন। সারাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত তাদের নিকট সংবাদ আসছে। কোথায় মিশনারীরা লোকদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। কোথায় কাদিয়ানী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কোথায় এনজিওরা মা-বোনদেরকে বেপর্দা করার ফিকিরে আছে। কোথায় আহলে হাদীস ফিতনা ভয়ংকর আকার ধারণ করছে। কোথায় শিয়া আর রেজভী গ্রুপ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে– এসব নিয়ে উলামায়ে কেরাম রাতদিন ব্যস্ত। এসব ফিতনা দমন করার জন্য ছাত্রদের জামাআত বানিয়ে সেসব এলাকায় পাঠাচ্ছেন, মাদরাসা স্থাপন করে সেসব এলাকায় স্থায়ীভাবে দীনের মেহনতকে চালু করার চেষ্টা করছেন। মাদরাসার ক্লাস বন্ধ করে নিজেরা দেশের আনাচে কানাচে ছুটে যাচ্ছেন। ওয়াজের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, মুনাযারার মাধ্যমে, প্রশাসনের নিকট সুপারিশের মাধ্যমে এসব ফিতনা দমনের চেষ্টা করছেন। এজন্য তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে প্রায় সারা বছরই মসজিদ-মাদরাসায় পড়ে থাকছেন। বিবি-বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত সময় দেয়ার মত ফুরসত পাচ্ছেন না। অসংখ্য-অগণিত ছাত্রকে হক্কানী আলেম বানিয়ে দেশে-বিদেশে প্রেরণ করেছেন। আমাদের কত ছাত্র ইউরোপ-আমেরিকায় মেহনত করছে। তাদের হাতে কত ইহুদী-খ্রিস্টান মুসলমান হচ্ছে। কিন্তু তথাকথিত তাবলীগওয়ালাদের দৃষ্টিতে এটা তাবলীগ না; তাবলীগ করতে হলে কাকরাইল বা নিজামুদ্দীন যেতেই হবে, চিল্লা দিতেই হবে।

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাবলীগের মেহনত শুরু করার পূর্বে হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষে ইসলাম টিকে ছিল সুফি-সাধক আর উলামায়ে কেরামের মেহনতে। তাদের কেউ আনুষ্ঠানিক চিল্লা লাগাননি। তাহলে তাদের মেহনত কি তাবলীগ ছিল না?

আপনি আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, টিউশনি সবকিছু ঠিক রেখে

বিবি-বাচ্চার সান্নিধ্যে থেকে তাদেরকে সময় দিয়ে আপনার সুযোগ মত একটা চিল্লা দিয়ে এসে আপনি হয়ে গেলেন দাঈ। কাজের সাথী। আর উলামায়ে কেরাম সারাবছর ডাল-রুটি খেয়ে, নির্ঘুম রাত কাটিয়ে আপনার সমকক্ষ হতে পারলেন না। আপনি কথায় কথায় তাদের সমালোচনা করেন। তাদের দোষ ধরেন। তাদের খেদমতকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন। অন্যদেরকে উৎসাহিত করেন আলেমদের কাছে না যাওয়ার জন্য; তাদের কথা না শোনার জন্য, মাদরাসায় ছেলেপেলে না দেয়ার জন্য। আপনি কিসের তাবলীগওয়ালা! আপনার কাজ তো ইসলামের দুশমন ইহুদীদের দোসরদের সাথে মিলে যায়। সাধারণ মুসলমানকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাদেরকে গোমরাহ করা সহজ। আপনি ইহুদীদের এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

এতায়াতীদের এইযে উলামা বিদ্বেষ, এর মূল কারণ হলো ব্যক্তিপূজা। মাওলানা সা'দ সাহেবের এতই ভক্ত যে, তার কোন ভুল মানতে তারা নারাজ। তাদের ধারণা হলো মাওলানা সা'দ সাহেব কোন ভুল করতেই পারেন না। তিনি যা বলছেন সব ঠিক; উলামায়ে কেরাম তার বয়ান বুঝতে ভুল করছেন কিংবা তার বয়ান কেউ ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আলেমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন।

অথচ সা'দ সাহেব তার বয়ানে যেসব মনগড়া কথা বলে আসছেন এবং কুরআন-হাদীসের যে বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছেন সে সম্পর্কে কিন্তু ভারতীয় আলেমরাই সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন কিংবা মুখ খুলেছেন। বাংলাদেশের আলেমরা তো জানতেনই না। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সর্বপ্রথম তার সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে– 'তার মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি নতুন এক মতবাদের জন্ম দিতে চলেছেন এবং নতুন একটা দল তৈরি করতে চলেছেন।' এরপরে ভারতের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম জনগণকে তার সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন।

কেউ যদি কুরআন-হাদীসের কোন মনগড়া ব্যাখ্যা বয়ান করে তাহলে তা শুধরে দেয়া, জনগণকে সতর্ক করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। উলামায়ে কেরাম এই দায়িত্ব পালন করে কি খুব অন্যায় করে ফেলেছেন! মাওলানা মওদুদী সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে, ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে উলামায়ে কেরাম যদি কোন ভুল না করে থাকেন তাহলে মাওলানা সা'দ সাহেব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে কেন অপরাধী হচ্ছেন? সা'দ সাহেবের সাথে তো বৈষয়িক কোন বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কোন মতভেদ নেই। তারা সর্বপ্রথম তার বিচ্যুতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরাসরি সতর্ক করেছেন। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাকে চিঠি লিখেছেন। এরপরেও যখন তিনি নিজের মতে অটল থেকেছেন, কল্যাণকামিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন। তখন উলামায়ে কেরাম তার সম্পর্কে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন।

এতায়াতী ভাইয়েরা উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বলে বেড়ায় যে, তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। নবীজীর যুগে অনেক সাহাবী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আলেম হলেই যে হিদায়াতের উপর থাকবে এটা কোন জরুরী না। যেকোনো সময় তারা গোমরাহ হয়ে যেতে পারে।

বেশ ভালো কথা। বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে আপনারা যে মন্তব্য করছেন সেটাতো মাওলানা সা'দ সাহেবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারতো। ইলিয়াস রহ. এর বংশের বলে তিনি সবসময় হকের উপর থাকবেন তার কখনো পদস্খলন হবে না এটা তো জরুরী না। কোন বংশের সাথে আল্লাহ পাকের বিশেষ কোন ওয়াদা নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যদি কাউকে অনুসরণ করতে হয় তাহলে নবীজীর সাহাবীদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে অনুসরণ করো। কেননা তাদের এখন গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু যারা জীবিত তাদের ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই; যেকোনো সময় তাদের পদস্খলন হয়ে যেতে পারে।

শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম সা'দ সাহেবের বিপক্ষে– আলমী শূরার পক্ষে আছেন। নিজামুদ্দীনের বড় বড় আকাবির উলামায়ে কেরাম যারা ৫০-৬০ বছর যাবত নিজামুদ্দীনে থেকে তাবলীগের মেহনত করে আসছিলেন তারাও সা'দ সাহেবকে ছেড়ে চলে গেছেন। এ থেকে সহজেই বুঝে আসে– সা'দ সাহেব কত নিচে নেমে গেছেন। প্রবীণ সাথীদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করেছেন। নিজের উস্তাদের সাথে বেয়াদবি করেছেন।

গত ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে দিল্লি থেকে আলেমদের একটা জামাআত এসেছিল বাংলাদেশে। তাদের মধ্যে ৮জন মুফতী সাহেব ছিলেন। যাদের অধিকাংশই দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ। তাদের একজন হলেন মুফতী শফীক আহমাদ সাহেব। যিনি ১৯৯৫ সালে দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়েছেন। এখন ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি নিজামুদ্দীনে দুই মাসের তারতীবে সময় কাটিয়েছেন। মশওয়ারায় মাওলানা সা'দ সাহেবের পাশেই বসতেন এবং মশওয়ারার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তার বর্ণনামতে হিন্দুস্তানের ৯৫ ভাগ উলামায়ে কেরাম আলমী শূরার সাথে আছেন। মাত্র ৫ ভাগ আলেম সা'দ সাহেবের সাথে আছে– যাদের অধিকাংশই নতুন। বিভিন্ন প্রদেশের উলামায়ে কেরামের জোড় হচ্ছে– সেখানে উলামায়ে কেরাম দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছেন। সা'দপন্থীরা সাম্প্রতিক তিনটি ইজতিমার কথা খুব জোরেশোরে প্রচার করে থাকে। তারা বলে বুলন্দশহর, আওরঙ্গাবাদ এবং করনালের ইজতেমায় লাখ লাখ লোক হয়েছে, যেটা সা'দ সাহেবের জনপ্রিয়তার আলামত।

মুফতী শফীক সাহেব বলেন, করনালের ইজতিমার জন্য তারা বিজেপি সরকার থেকে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল যেটা সংখ্যালঘু ফান্ড থেকে সরকার দিয়েছিল। কিন্তু সরকার এই টাকা তাদের হাতে না দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা ইজতিমার ময়দানের কাজ করিয়ে তাদেরকে বিল দিয়ে দিয়েছে। লাখ লাখ লোকের সমাগম হবে মনে করে বিশাল প্যান্ডেল করা হয়েছিল। কিন্তু তার দশভাগের একভাগও ভরেনি। বুলন্দশহরে ইজতিমা করার জন্য লোকজন থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা তোলা হয়েছিল। এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। অনেক লোক তাদের থেকে একথা বলে সরে এসেছে যে, এটা আবার কেমন ইজতিমা যেখানে জনগণকে চাঁদা দিতে চাপ দেয়া হয়েছে। এর আগে তো তাবলীগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি।

আর আওরঙ্গাবাদের ইজতেমায় সাধারণ লোকজন জমা হয়েছিল দীনের খাতিরে; সা'দ সাহেবের মহব্বতে নয়। কেননা তারা জানেই না, কে সেখানে বয়ান করবেন। মুফতী শফীক সাহেব বলেন, তারা এখন সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার

উপর চলছে। মিথ্যাই তাদের বড় পুঁজি। প্রশাসন এবং প্রভাবশালীদেরকে ঘুষ দিয়ে তারা ম্যানেজ করছে। কোথাও কোথাও পেশীশক্তির ব্যবহার করছে। নিজামুদ্দীন মারকাযে এমন এমন লোকদের আনাগোনা চোখে পড়েছে যারা যাদু-টোনা, তাবিয-কবয এসব জিনিসের সাথে জড়িত।

মুফতী শফীক সাহেব বলেন, উলামায়ে কেরামের ব্যাপক সমালোচনার পর মাওলানা সা'দ সাহেব ২০১৭ সালে তিন-চারটা বয়ান থেকে রুজু করার ঘোষণা দেন। এ নিয়ে সাথীরা খুব লাফালাফি করতে থাকে যে, তিনি তো রুজু করেছেন। তারপরও কেন তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে?

কিন্তু রুজু করার বাস্তবতা হলো, সকালে যে বিষয় থেকে রুজু করার ঘোষণা দিয়েছেন সন্ধ্যায় সেটাই আবার জোরেশোরে বয়ান করেছেন। এটাতো রুজু নয়– রুজুর নামে তামাশা।

ভারতের উলামায়ে কেরামের সংগঠন বেফাকু উলামায়ে হিন্দের তত্ত্বাবধানে ২০১৮ সালে নিজামুদ্দীন মারকাযে মাওলানা সা'দ সাহেবের করা প্রায় ১৫০টি বয়ান সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৬০টি বয়ান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উলামায়ে কেরাম মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন এবং প্রায় প্রতিটি বয়ানেই আপত্তিকর ব্যাখ্যা তথা কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেখতে পান। সেসব বয়ানের অডিও উলামায়ে হিন্দের ওয়েবসাইটে গেলে যে কেউ শুনতে পাবেন।

বেফাকু উলামায়ে হিন্দের উদ্যোগে সেসব আপত্তিকর বয়ানের জরুরী ব্যাখ্যাসহ পুস্তিকা আকারে ছেপে ভারতের বড় বড় মাদরাসা এবং আলেম-উলামার খেদমতে প্রেরণ করা হয়। মাওলানা সালমান মনসুরপুরী, মুফতী শাব্বীর আহমাদ কাসেমী, মাওলানা মাহমূদ মাদানী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম তার এসব বয়ান শুনে দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্বেগের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন।

আল্লাহপাকের মেহেরবানীতে উলামায়ে কেরামের চতুর্মুখী মেহনতের ফলে ভারতে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ দলে দলে সা'দ সাহেব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোক তার সাথে আছে।

আর বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত সাথীরা এখন সা'দ সাহেবের বড় হাতিয়ার। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এখন আলমী শূরার তত্ত্বাবধানে তাবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমাদের সকলকে বাস্তবতা উপলব্ধি করে উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রেখে তাবলীগের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

মাওলানা সা'দ সাহেব এ বছরের আগস্টের ৩০ তারিখ থেকে নিজামুদ্দীন মারকাযে পাঁচ দিনব্যাপী পুরাতন সাথীদের জোড় ডেকেছিলেন। এতায়াতীরা জোরদার তাশকিল করে ফ্রি ভিসা-টিকিট, থাকা-খাওয়া ইত্যাদির প্রলোভন দেখিয়ে অনেক সরলমনা তাবলীগের সাথীকে নিজামুদ্দীন নিয়ে গিয়ে নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করেছে। জীবনে কোনদিন ইন্ডিয়া যায়নি। ফ্রি ফ্রি যাওয়ার টোপ দিলে কে না যেতে চাইবে!

২৬ আগস্ট ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসার সময় বেনাপোল চেকপোস্টে বহু লোককে দেখলাম নিজামুদ্দীন যাওয়ার জন্য লাইন ধরেছে। অনেকের সাথে আলাপ করে বুঝলাম, একেবারেই নতুন সাথী। জীবনে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের লোভ সামলাতে পারেনি। ঢাকায় আসার পর আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন আলেমের সাথে আলাপ হলে তারা জানালেন যে, তাদের মহল্লার আমীর সাহেবরা তাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, হুযূর! শুধু আমাদেরকে পাসপোর্টটা দিন, বাকি দায়িত্ব আমাদের। এভাবে তারা টাকা-পয়সা ছড়িয়ে লোকদেরকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে।

খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, টাকা-পয়সা দিয়ে হককে কখনো দমন করা যায় না, হককে কখনো কেনা যায় না। টাকা-পয়সার জোরে হককে যদি দমন করা যেত; তাহলে আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ কবেই কাদিয়ানী, আহলে হাদীস আর জামায়াতে ইসলামী হয়ে যেত। কেননা তাদের টাকা-পয়সা অনেক। ২০০ বছর ধরে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে যাচ্ছে। কিন্তু উলামায়ে কেরামের মেহনত আর সতর্ক প্রহরার কারণে আল্লাহ পাক ইসলামকে হিফাযত করেছেন। এতায়াতীদেরও অনেক টাকা-পয়সা। যেসব আলেম নামধারী ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিয়েছে তারা লাখ লাখ টাকা পাচ্ছে। যেসব মসজিদের ইমাম তাদের পক্ষাবলম্বন করছে তাদের বেতন দ্বিগুণ করে দিয়েছে। জোড়ের নামে ৮/১০ মসজিদের সাথীদেরকে কোন এক মসজিদে একত্রিত করে রকমারি খাবার-দাবার চলছে। পেশীশক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর নাম তাবলীগ! ব্যক্তিপূজা কি মানুষকে এ রকম অন্ধ করে ফেলে?

আমাদের পরিচিত এক লোক সা'দ সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজামুদ্দীন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাসায় বিবি-বাচ্চা সকলে আলেমদের পক্ষে। তারা নিষেধ করল যাওয়ার জন্য। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সে বলল, আলেমরা সব খেকশিয়াল– মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে আবার গর্তে লুকিয়ে যায়। দীনের প্রকৃত মেহনত তো আমরাই করি, আমরা সবসময় ময়দানে আছি।

এখানে প্রথম কথা হলো, উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করার কারণে তার ঈমান আছে কি না সন্দেহ। বড় কোনো মুফতী সাহেবের নিকট গিয়ে তাহকীক করা দরকার। ঈমান যদি না থাকে তাহলে তো সব মেহনত বেকার। দ্বিতীয় কথা হলো, যে ব্যক্তি এই মন্তব্য করল সে তাবলীগ কি জিনিস তাই বুঝেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, ক্ষেত-খামার, নিজের ধান্দা সবকিছু ঠিক রেখে বছরে এক চিল্লা আর দৈনন্দিন কিছু মেহনত করার নামই যদি তাবলীগ হয়, তাহলে উলামায়ে কেরাম যারা মাত্র ৮/১০ হাজার টাকা বেতনে, বাড়িঘর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মাদরাসা-মসজিদে পড়ে রয়েছেন, সুযোগ পেলেই দেশের আনাচে-কানাচে সফর করছেন, লেখনী আর বয়ানের মাধ্যমে হাজারো লোকের জীবনে পরিবর্তন আসছে, সেটা কি তাহলে তাবলীগ নয়? হাজার হাজার ছাত্রের পিছনে মেহনত করে তাদেরকে দীনের ধারক-বাহক বানিয়ে দেশে-বিদেশে দীনের খেদমতের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এটা কি তাবলীগ নয়? তাবলীগ শুধু আপনিই বুঝলেন। সামান্য একটু সময় লাগিয়ে এ রকম অহংকার যদি আপনার মধ্যে আসে তাহলে তো আপনার সবই হারালেন!

সুতরাং সাবধান! নিজের ইহকাল-পরকাল বরবাদ করবেন না। আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের পরামর্শমতো তাবলীগ করুন। ইনশাল্লাহ কামিয়াবী আসবে।

লেখক : সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব, বাইতুস সুজূদ জামে মসজিদ, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো টঙ্গী ইজতিমার ময়দানে অনুষ্ঠিত মাস্তুরাতের জোড়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত

তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

পটভূমি

তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ. ছিলেন 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবের মূল লেখক শাইখুল হাদীস হাফেয যাকারিয়্যা রহ.-এর সুযোগ্য জামাতা, দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর সুযোগ্য ভায়রা এবং আমি বয়ানলেখক (প্রফেসর) শেখ আবুল ক্বাসিম-এর শাইখ ও মুর্শিদ। (বাইআত গ্রহণের তারিখ : ১৭ জুন ১৯৮০)। ১৯৯৫ সালে তিনি বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমায় শেষবারের মতো শরীক হয়ে শনিবার বাদ মাগরিব ৬ সিফাতের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন। রবিবার বাদ আসর সুন্নাত তরীকায় বিবাহের উপর জরুরী বয়ান করেন। সোমবার সকালে হিদায়াতের কথার পর আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন এবং একই বছর পবিত্র আশুরার দিন জুম'আবার জুম'আর নামাযের পর এই দুনিয়া ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আগের বছর ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত টঙ্গী ইজতিমা (১৫, ১৬, ১৭ জানুয়ারি)-এর পর ২১ জানুয়ারি জুম'আবার টঙ্গী ইজতিমার ময়দানে বিদেশী মেহমানদের জন্য নির্মিত তাঁবুতে প্রথমবারের মতো সারাদেশের মহিলাদের (মাহরামসহ) উদ্দেশ্যে জোড় ও বয়ান অনুষ্ঠিত হয়। মাস্তুরাতের এ জোড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বয়ান হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমি (বয়ান লেখক) আমার চার বছর হতে ছয় মাস বয়স্ক প্রথম চার সন্তানসহ তাদের মা-কে নিয়ে এ জোড়ে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। বরকতময় এ জোড়, জোড়ের বয়ান ও দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমার সেই চার সন্তানের সবাই ইতোমধ্যে হাফিযে কুরআন ও আলেমে দীন হওয়ার তাওফীক পেয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে তিনজন ইফতা সমাপনকারী ও তাবলীগে সাল লাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে। বরকতময় এ জোড়ের দু'টি বয়ানের প্রথমটি পেশ করেন হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী সাহেব রহ., যা রাবেতা যিলকদ-যিলহজ্জ ১৪৪০/জুলাই-আগস্ট ২০১৯ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে এবং দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বয়ানটি (সকাল ১১:১১-১২:৩১ পর্যন্ত) পেশ করে দু'আর মাধ্যমে জোড়ের সমাপ্তি টানেন তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে এখন সেই দ্বিতীয় বয়ানটি উপস্থাপন করব। আল্লাহ তা'আলা দয়ামায়া করে এ লেখাকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন, সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন, সারাবিশ্বের বর্তমান ও কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত উম্মতকে সহীহভাবে বুঝে, সহীহভাবে আমল করে উভয়জগতে সত্যিকার কামিয়াবী নসীব করুন। আ-মী-ন।

হামদ ও সালাতের পর নিম্নলিখিত আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন–

يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقكم...

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সে-ই, যে তোমাদের মধে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত-১৩)

এরপর বলেন,

আমার প্রিয় ভাই ও বোন সকল!

আল্লাহ পাক এ দুনিয়াকে আবাদ করেছেন, গড়ে তুলেছেন। এক হলো এর যাহেরী আবাদী। আর এক হলো এর হাকীকী আবাদী। দুনিয়ার যাহেরী আবাদী হয় পুরুষ ও মহিলার মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরুষ-মহিলার মিলনে সন্তান পয়দা হয়। এভাবে এক-দুই করে বাড়তে বাড়তে জনপদ গড়ে ওঠে। আর হাকীকী আবাদী হয় দীনী পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে। পুরুষ ও মহিলা মিলে একে অপরকে দীনের কাজে সহযোগিতা করলে দীনের পরিবেশ কায়েম হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمراة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم...الخ.

অর্থ : জেনে রাখো, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, ... পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানাদির দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৯২৮)

তাই পুরুষ ও মহিলা একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে যার যার যিম্মাদারী আদায় করবে। এতে করে আমার ঘরে দীনের আমল হবে। নামায হবে। তিলাওয়াত হবে। যিকির হবে। মোটকথা আমি আমার ঘর-সংসার দীনের আমল দ্বারা আবাদ রাখব। তাহলে আমার ঘরে যত সন্তানাদি আসবে, যত আওলাদ এ পরিবেশে পয়দা হবে, সবাই দীনদার হবে। কারণ পরিবেশের প্রভাব সন্তানাদির উপর ক্রিয়াশীল হয়।

সাদেগী এখতিয়ার করা, জাঁকজমক পরিহার করা

মা-বোনের যেহেন তথা চিন্তা-চেতনা যদি দীনী হয়, পুরুষদের মধ্যেও দীনের জযবা পয়দা হবে। তেমনি আনেওয়ালী নসল (ভবিষ্যৎ প্রজন্ম)-এর মধ্যেও দীনের শওক ও জযবা

পয়দা হবে, দীনের উপর চলার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। এজন্য আমাদের মুআশারাত তথা সামাজিকতা ও জীবন-যাপন পদ্ধতি যেন দীনী হয়। অর্থাৎ আমি থাকবো তো দুনিয়ায়, কিন্তু প্রস্তুতি নেবো আখেরাতের।

আল্লাহ তা'আলা আওরতকে পয়দা করেছেন যাতে পুরুষ সান্ত্বনা পায় এবং তাদের দিলে প্রশান্তি আসে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وجعل منها زوجها ليسكن اليها .

(অর্থ :) তিনিই পুরুষ থেকে তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ-১৮৯)

মাস্তুরাত পুরুষের সান্ত্বনা লাভের উপায়

পুরুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে মাস্তুরাতের সাথে মিলিত হলে সব ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম যখন পেরেশানহাল হয়ে ঘরে ফিরতেন, তাকে সান্ত্বনা দিতেন হযরত খাদিজা রাযি.। যখন প্রথম ওহী নাযিল হয়, নবীজী একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরেন। হযরত খাদিজা রাযি. তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করবেন না। তারপর আপন চাচাতো ভাইয়ের কাছে নিয়ে যান। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হলো মহিলা যেন পুরুষের প্রশান্তির যরিয়া ও উপায় হয়।

আমি যদি আমার চাল-চলন সাদাসিধা রাখি, যদি পুরুষকে দীনের কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করি, দীনের কাজে সহযোগিতা করি তাহলে এটা একদিকে দুনিয়াবী সমস্যাবলী সমাধানের উপায় হবে, অপরদিকে আখেরাতের সমস্যাবলী সমাধানেরও যরিয়া বনবে।

এজন্য পুরুষদেরকে আখেরাতের আমলের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। নিজেকে এই কাজে নিয়োজিত রাখি। তাহলে আমার জীবনও শান্তির সাথে কাটবে আর স্বামীর জীবনও শান্তির সাথে কাটবে। ইতমিনানের সাথে যিন্দেগী কেটে যাবে।

আর যদি দুনিয়ার খাহেশের পিছে পড়ি, তাহলে উভয়ে পেরেশান থাকবো। কারণ দুনিয়া খাহেশ পুরা করার জায়গা নয়। এখানে এক খাহেশ পুরা হলে আর এক খাহেশ সৃষ্টি হয়। এমনকি এভাবে খাহেশের পেছনে ছুটতে ছুটতে মওত এসে যায়।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা একটি দাগ টানলেন। অতঃপর লম্বা দাগটির পাশে ছোট ছোট কয়েকটি দাগ টানলেন। তারপর বললেন, ছোট দাগগুলো হলো খাহেশাত; যার শেষ নেই। আর লম্বা দাগ হলো মওত; মওত এসে যায়, কিন্তু খাহেশ পুরা হয় না।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. বলেছেন, মানুষের খাহেশের শেষ নেই। দুনিয়ায় খাহেশ শেষ হলে আখেরাতের খাহেশ করতে থাকে।

যদি খাহেশাতের উপর চলতে থাকি মওত পর্যন্ত সুকূন ও প্রশান্তি পাব না; মওতের পরও সুকূন পাব না। পক্ষান্তরে যদি ঈমান-আমলের খাহেশ করি এবং অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করি, দুনিয়াতেও শান্তি পাব, আখেরাতেও শান্তি পাব। খাহেশকে খাটো করা কোন সুকঠিন ব্যাপার নায়। শুধু অন্তরকে ঘুরিয়ে দিলেই হলো। অন্তর এখন দুনিয়ার দিকে ফিরে আছে। এটাকে আখেরাতের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এতে আখেরাতের সুখ-শান্তিও মিলবে। আর দুনিয়ার জীবনটাকে আল্লাহ সহজ করে দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কেউ আখেরাতের ফিকির করে, তার দুনিয়া সাজানোর ব্যবস্থা আল্লাহ নিজে করে দেন। আর যে খাহেশাতের পেছনে ছোটে, সে কোথায় গিয়ে হালাক হবে আল্লাহ তার পরোয়া করেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من تواضع لله رفعه الله، فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو فى أعين الناس صغير وفى نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب اوخنزير.

অর্থ : যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করে দেন, ফলে সে নিজে কাছে ছোট হলেও মানুষের চোখে বড় থাকে। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে ছোট করে দেন, ফলে সে মানুষের চোখে ছোট থাকে যদিও নিজের কাছে বড় থাকে, একপর্যায়ে সে মানুষের কাছে কুকুর-শুকর থেকেও তুচ্ছ হয়ে যায়। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী, হা.নং ৭৭৯)

দুনিয়ায় খাহেশের শেষ নেই

হযরত আবূ দারদা রাযি. দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! মনের অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে থেকে পানাহ চাই।

মনের অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা হলো মন বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো, মনের মধ্যে পেরেশানী আর পেরেশানী। মন যখন এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, মনের মধ্যে পেরেশানী থাকে। এভাবে পেরেশানীর পেছনে ছুটতে ছুটতেই জীবন শেষ হয়ে যায়।

আর যদি আখেরাতকে মাকসাদ বানানো হয়, মন আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকে, আল্লাহ এমন মনকে দুনিয়ার পেরেশানী থেকে মুক্তি দিবেন। দুনিয়ার জীবনইবা কয়দিনের? সুতরাং দুনিয়া নিয়ে এত পেরেশান হতে নেই।

যার সামনে আখেরাত থাকে সে আখেরাতের আমল করতে মজা পায়। যার সামনে দুনিয়া থাকে সে দুনিয়ার আমল তো করে, কিন্তু তাতে দিলের শান্তি পায় না। পক্ষান্তরে আখেরাত সামনে থাকলে জীবন আরামে কাটে এবং আল্লাহ চাইলে আখেরাতও ভাল কাটবে।

দুনিয়ার হাকীকত

وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور.

অর্থ : পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ- ২০)

সন্তানাদি, ধন-সম্পদ, খেল-তামাশা, জাঁক-জমক সব 'মাতাউল গুরুর' ধোঁকার সামানা। এর মধ্যে কোন হাকীকত নেই। মানুষ এতে ফেঁসে

যায়। দুনিয়ার জীবন পেরেশানীর হয়। আখেরাতের জীবনও পেরেশানীর হয়। ব্যস মেরে আযীয বহেনো!

আমার আখেরাতের চিন্তা মাথায় নিয়ে নিই; জীবন সহজ হয়ে যাবে। দুনিয়ার হাজার চিন্তার বদলে এক আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাই। দুনিয়ার হাজার চিন্তা মাথায় নিলে মানুষ পেরেশান হয়। আমাদের আখেরাত সুন্দর হোক, দুনিয়া নষ্ট হয় হোক।

মানুষের আমল তার চিন্তা অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা এই হোক যে, আমাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে, মহিলা সাহাবীদের সঙ্গে আমাদের মহিলাদের হাশর হতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ফেঁসে গেছে আমার হাশর যেন তার সঙ্গে না হয়।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. খলীফা হওয়ার পর তার দিলের গতি ফিরিয়ে নিলেন। খিলাফতের দায়িত্বের চাপে গোলাম-বাঁদি সব বিদায় দিয়ে দিলেন। তাঁর বিবি ছিলেন হযরত ফাতিমা রহ.। দুনিয়ার ইতিহাসে এই একজন মহিলাই পাওয়া যায়, যার পিতা বাদশাহ, ভাইও বাদশাহ, স্বামীও বাদশাহ।

ফাতিমা বাদশাহর একমাত্র কন্যা ছিলেন। পিতার আহ্লাদের ছিলেন, ভাইয়ের আদরের ছিলেন। বিয়েতে অনেক উপহার-উপঢৌকন পান। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. স্ত্রী ফাতিমার সামনে আখেরাত তুলে ধরেন। ফলে শাহজাদী ও রানী হয়েও তিনি ঘরের কাজ নিজেই করতেন।

একবার এক বুড়ী এসে বলল, রানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ফাতিমা তখন নিজ হাতে রুটি বানাচ্ছিলেন। জবাবে বলা হল, তুমি যার সাথে কথা বলছো তিনিই বাদশার বেগম ও রানী।

এরপর বুড়ী দেখল একলোক দেয়াল গাঁথার কাজ করছে। বুড়ী ফাতিমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, লোকটা বার বার তোমার দিকে তাকাচ্ছে কেন? ফাতিমা বললেন, অসুবিধা নেই, উনি আমার স্বামী। তারপর বুড়ী বলল, ঘরের অবস্থা এমন কেন? ফাতিমা জবাব দিলেন, আমরা আমাদের নিজেদের ঘর উজাড় করেছি যাতে দেশের সব ঘর আবাদ হয়ে যায়, নয়তো দেশের সব ঘর উজাড় করে আমরা আমাদের ঘর আবাদ করতে পারতাম।

খলীফা হওয়ার পর উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. যখন তার সামনে আখেরাত তুলে ধরেন এবং তার সমস্ত সামান বাইতুল মালে জমা করতে বলেন, ফাতিমা নির্দ্বিধায় তার সব সামানা বাইতুল মালে জমা দিয়ে দেন এবং বলেন, মায়ের স্মৃতি হিসেবে শুধু একটা হার নিজের কাছে রাখতে চাই। উমর ইবনে আব্দুল আযীয বলেন, ফাতিমার সঙ্গে হার আর খলীফা দু'টো একত্রে থাকবে না; হয় হার থাকবে, নয় খলীফা থাকবে। ফাতিমা খলীফাকে প্রাধান্য দিয়ে খুশিমনে সেই হারটিও বাইতুল মালে জমা দিয়ে দেন। এভাবে তারা দুনিয়ার পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে আখেরাতে কামিয়াব হন।

হযরত সালমান রাযি. মৃত্যুর সময় কাঁদছেন। কেন? কবরে সাপের ভয় করছেন? কেন? তাঁর কাছে একটা লোটা ও কিছু জরুরী জিনিস ছিল। তাঁদের সামনে মওতের পরের জীবন ছিল।

দিল জোড়ার দরকার। দিলের গতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। দুনিয়ার জিনিসের খাহেশ না হয়। শয়তান চায় দিল যেন আখেরাত থেকে গাফেল থাকে। যাতে আখেরাত বরবাদ হয় ও দুনিয়ায় ফেঁসে থাকে। আমাকে আখেরাতের আমল আপনাতে হবে। তাতেই দিল লাগাতে হবে।

মুহতারাম মা-বোন!

আমাদের আখেরাতের ধ্যান হোক, আখেরাতের আমলে আমাদের দিল নিমগ্ন হোক। ঘরে ঈমানের আলোচনা করি। নামাযের ইহতিমাম করি। যিকিরের ইহতিমাম করি। তিলাওয়াতের ইহতিমাম করি। তা'লীমের ইহতিমাম করি। আমার ঘর আসবাবপত্রের পরিবর্তে আমলের দ্বারা আবাদ হোক। যে ঘরে দুনিয়ার আলোচনা হয়, সে ঘরে বরকত হয় না। আমল দ্বারাই মানুষের সত্যিকার সান্ত্বনা হাসিল হয়। এজন্য ঘরকে দীনের সামানা দ্বারা আবাদ করি।

ঘর যদি কুঁড়েঘরও হয়, কিন্তু তার মধ্যে আখেরাতের আমল হয় তাহলে ঘরের ভেতর নূরানী হয়, ঘরে সাকীনা আসে। ভাল আমলের প্রভাব ভাল হয়। দুনিয়ার চীজ-আসবাবের প্রভাব পেরেশানী বয়ে আনে। সুতরাং আমি আমার ঘরকে নূরানী বানাই। ঈমানী বানাই। আমার ঘরকে শয়তানের আড্ডা না বানাই।

আমল দ্বারা দুনিয়ায় আছর হয়। আমল দ্বারা কবরেও আছর হয়। আল্লাহ পাক আমাদের দিলগুলো আখেরাতের দিকে ঘুরিয়ে দিন। আমাদেরকে আখেরাতের আমল করার তাওফীক দিন। আমাদের ঘর নূরানী আমাল দ্বারা ভরপুর হয়ে যাক। আমাদের আখেরাত নিরাপদ ও শান্তিময় হোক।

মহিলারা একজায়গায় জড়ো হলেই সারা দুনিয়ার আলাপ জুড়ে দেয়। দুনিয়ার আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, কবর ও হাশরের কথা আলোচনা হলে দিলেও নূর হবে, ঘরেও নূর হবে। আমাদের ঘরগুলো যেন শয়তানের আড্ডাখানা না হয়। ঘরে কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নামের কথা বলব। এতে ঘর আবাদ হবে। দুনিয়ার কথায় দিল মুর্দা হয়। ঘরের বরকত চলে যায়। দিলের মধ্যেও অন্ধকার দেখা দেয়। এজন্য বেশি বেশি আল্লাহ ও রাসূলের কথা বলা। দুনিয়ার কথায় দিল মরে যায়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, দুনিয়ার আলোচনা হলো অসুস্থতা আর আখেরাতের আলোচনা তার শিফা ও চিকিৎসা। হ্যাঁ, দুনিয়াবী কথা প্রয়োজন অনুপাতে হতে পারে, প্রয়োজন ছাড়া অন্য সব কথা আখেরাতের জন্য হোক, আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করার জন্য হোক। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তাওফীক দিন, আমাকেও তাওফীক দিন।

বাইআত

যারা বাইআত হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তারা রশি ধরি। রশি পাওয়া না গেলে

নিয়্যাত করি। বাইআত হলো আল্লাহর সাথে বান্দার অঙ্গীকার যে, আয় আল্লাহ! বাকী জীবন আপনার হুকুম মতো ও আপনার নবীর তরীকায় চলব। আমি পেছনের নাফরমানীর জীবন থকে তাওবা করলাম, বাকী জীবন ফরমাবরদারীর সাথে চলার ওয়াদা করলাম।

যা বলা হয় মনোযোগ দিয়ে শুনি। মুখে উচ্চারণ করি; তবে অনুচ্চস্বরে, যেন আওয়ায বাইরে না আসে। বলুন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদাত করার উপযুক্ত নেই, দিল লাগানোরও উপযুক্ত কেউ নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল ও পাক বান্দা।

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর (অর্থাৎ, ভালো মন্দ যা কিছু হয় সব আল্লাহর তরফ থেকে হয়।) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনলাম তেমনভাবে যেমন তিনি আছেন তার নাম ও গুণাবলীসহ। আর আমি কবুল করলাম তাঁর সমস্ত হুকুম আহকাম।

আমি তওবা করলাম শিরক হতে, কুফর হতে, বিদআত হতে, অন্যের মাল না-হকভাবে খাওয়া হতে, না-হক খুন করা হতে, চুরি হতে, যিনা হতে, শরাব হতে, জুয়া হতে, সুদ হতে, মিথ্যা হতে গীবত হতে, সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা হতে, দীনের প্রচার-প্রসারে ত্রুটি ও অলসতা হতে, দীন শেখায় অলসতা করা হতে এবং সব রকম গুনাহ হতে। আমি অঙ্গীকার করলাম শিরক করব না, কুফরী করব না, বিদআতে লিপ্ত হবো না। ইনশাআল্লাহ তামাম গুনাহ হতে বেঁচে থাকব। আয় আল্লাহ! তাওবা কবুল করো, আমাকে অঙ্গীকারে মজবুত রাখো।

আমি বাইআত হলাম হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ.-এর হাতের উপর ইন'আমুল হকের মাধ্যমে।

বাইআতের মধ্যে যে গুনাহগুলোর কথা বলা হলো, এগুলো কবীরা গুনাহ, বড় গুনাহ। এর মধ্যে কিছু আছে এমন যেগুলোকে ছোট মনে করা হয়, অথচ সেগুলোও বড় গুনাহ। কাজেই কোন গুনাহকে মামুলী মনে না করি। আমরা ছোট মনে করি এমন কিছু গুনাহ তো যিনার চেয়েও খারাপ। যেমন গীবত, মিথ্যা অপবাদ।

গীবত কী? গীবত হলো, শুধু শুধু কারো দোষত্রুটি আলোচনা করা। সাবধান করার জন্য হলে আলাদা কথা। আর যদি দোষ না থাকা সত্ত্বেও আলোচনা করা হয় তাহলে সেটা তো অপবাদ। মিথ্যা গীবত ও অপবাদের গুনাহ মানুষ যবানের মাধ্যমে করে থাকে। এজন্য যবানের হেফাযত খুব জরুরী। বান্দা এসব গুনাহকে সাধারণভাবে নিলেও আল্লাহর কাছে তা অত্যন্ত কঠিন।

এতক্ষণ আমরা যে সব খারাবীর নাম ধরে তাওবা করেছি সেগুলো থেকে বেঁচে থাকি। কারো সম্পদ না-হক নষ্ট করাও বড় গুনাহ। এটা থেকেও বেঁচে থাকি। অন্যের মাল বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা থেকেও বেঁচে থাকা দরকার। এটাও গুনাহ।

যে সব গুনাহ থেকে বাঁচতে বলা হলো হিম্মতের সাথে বেঁচে থাকবো। আর পাঁচটি আমল ইহতিসাবের সাথে করবো। এই পাঁচটি আমল করলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে। আমল পাঁচটি এই–

১. নামায। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বহুত জরুরী, বহুত আহাম। যতক্ষণ হুঁশ থাকে নামায পড়বই পড়ব; পুরুষরা মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আর মা-বোনেরা ঘরে আউয়াল ওয়াক্তে। দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসেও না পারলে শুয়ে, উযূ করার ব্যাপারে শরঈ উযর থাকলে তায়াম্মুম করে। আল্লাহ তা'আলা সহজতার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু নামায ছাড়ার অনুমতি দেননি।
সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নফল নামায। এগুলোরও ইহতিমাম করি। যেমন ইশরাক, চাশত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ। বিভিন্ন হাদীসে এই ৪ প্রকার নফলের ফাযীলতও বর্ণিত হয়েছে।

২. যিকির। সকাল-বিকেল দুই বেলা ইহতিমামের সাথে তিন তাসবীহ আদায় করি। তিন তাসবীহ এই–
এক. সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার; ১০০ বার।
দুই. দরূদ শরীফ; ১০০ বার।
তিন. ইস্তিগফার; ১০০ বার।

৩. কুরআনে পাকের তিলাওয়াত। যারা শুদ্ধ করে পড়তে পারি রোযানা পড়ি। বাকীরা শিখতে থাকি। শিখতে শিখতে মওত এসে গেলে যারা পড়তে পারে তাঁদের সাথে হাশর হবে।

৪. ফাযাইলে আমাল কিতাব হতে তা'লীম। পুরুষরা মসজিদে শুনি। আর মা-বোনেরা যে কোন একটি সময় ঠিক করে তালীম করি।

৫. গাশতের আমল। পুরুষদের জন্য সপ্তাহে দুই গাশত, মাসে ৩ দিন এবং বছরে কমপক্ষে ১ চিল্লা– যত দূরে যেতে পারি যাবো। মহিলারা পুরুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে উদ্বুদ্ধ করবো। এতে পুরুষের সমান সাওয়াব পাবো ইনশাআল্লাহ।

এ আমালগুলো ইহতিমামের সাথে করি। যেগুলো ছাড়তে বলা হয়েছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকি। তাহলে আমাদের ঘর ঈমানী আমল দ্বারা আবাদ হবে ও ঘরে নূর হবে।

[বি.দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালাহ অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী- অত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শা'বান- ২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা)]

আ ত্ম জী ব নী

দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, বর্তমানে দারুল উলূম করাচীর অধ্যয়নরত **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।**

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(অষ্টম পর্ব - (آٹھویں قسط

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পরও কিছুদিন আমাদেরকে মক্কা মুকাররমায় থাকতে হয়েছিল। এ দিনগুলোতে আমি আমার আম্মাজানকে তওয়াফ করাতে নিয়ে যেতাম। এতদিনে তওয়াফের প্রায় সবগুলো দু'আ আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আমি শব্দ করে পড়তাম। তাওয়াফরত অনেক মহিলাও দু'আগুলো পড়তে থাকতেন।

মক্কা মুকাররমা সে সময় একটি ছোট্ট শহর ছিল। আমাদের যাতায়াত হারাম শরীফের সন্নিকটে অবস্থিত একটি ছাদযুক্ত মার্কেট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরে জানতে পেরেছি এই বাজারকেই سوق المدى অথবা سوق الليل বলা হতো। (বর্তমান সম্প্রসারণ ও সংস্কারকাজে এই বাজারের অস্তিত্ব পুরোটাই মিটে গেছে।) হাজী সাহেবের একমাত্র পুত্র ধীরেধীরে আমাদের বন্ধু বনে গেলেন। তিনি আতরের জগতে বিখ্যাত নাম السرتي এর মালিক ছিলেন। (বর্তমানে তার পুত্র অর্থাৎ হাজী সাহেবের পৌত্র এই ব্যবসার মালিক।) হাজী সাহেবের পুত্র মাঝে-মধ্যে আমাদেরকে সেই বাজারে নিয়ে যেতেন। সে সময়ে পাকিস্তানী ষোল আনায় এক রুপি হতো। আর এক রিয়ালের মূল্যমান ছিলো বিশ আনা। সেই বাজারে এক রিয়ালে একটি শরবত পাওয়া যেতো। শরবতটি আমার খুবই পছন্দনীয় ছিল। তাওয়াফের ফাঁকে যতটুকু সময় পেতাম ততটুকু সময় হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে শরবত পান করাই হতো আমার একমাত্র কাজ।

মক্কা মুকাররমার পর মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার সময় এসে গেলো। জানা গেলো, মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার পাকা সড়ক নেই। আর কাঁচা সড়কে বাসে যাওয়াটা শংকামুক্ত নয়। কারণ, কাঁচা সড়কে ড্রাইভার বেপরোয়া গাড়ী চালালে যাত্রীদের মাথা গাড়ীর ছাদের সাথে ধাক্কা লেগে আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া বাসযোগে গন্তব্যে পৌঁছতে সময়ও অনেক লেগে যাবে। সুতরাং আব্বাজান রহ. বিমানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেজন্য পুনরায় জেদ্দা গেলেন। জানা গেল, বিমান মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে যাত্রা করবে। সুতরাং আমরা আসরের পূর্বে বিমানবন্দর পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরই বা কী ছিলো! একটি ছোট্ট ভবন, যেখানে সব যাত্রীর স্থানসংকুলান কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। ভবনের বাইরে মাটিতে বসেই যাত্রীদের বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো। আমরাও সেখানে কাপড় বিছিয়ে বসে পড়লাম। এটাই ছিল আমার বিমানে চড়ার প্রথম উপলক্ষ। এজন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হাজিরীর আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও আমার মনে এই শিশুসুলভ আগ্রহও উঁকি দিচ্ছিল যে, এই নতুন বাহনে এবার প্রথম যাত্রা হবে। ঘোষণা ছিল মাগরিবের আগে আগে বিমান ছাড়বে; কিন্তু মাগরিবের পর সেখানে বসে বসেই ইশার সময় হয়ে গেলো। তবু বিমান ছাড়ার কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিলো না। ইশার পরও অপেক্ষার পালা চলছিল। এভাবেই রাতের একটি বড় অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। যাত্রীরা ঘুমিয়ে যেতে লাগলেন।

রাত বারোটার দিকে একজন বিমান-প্রতিনিধি আসলেন। তার হাতে যাত্রীদের একটি তালিকা ছিল। তিনি একে একে যাত্রীদের নাম ডেকে সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করছিলেন। শেষদিকে একজন মহিলা যাত্রীর নামের পূর্বে 'মুসাম্মাত' লেখা ছিল। তিনি এটাকেও কারো নাম মনে করে বারবার 'মুসাম্মাত, মুসাম্মাত' বলে ডাকছিলেন। কিন্তু কে সাড়া দেবে এই নামে? তিনি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ডেকেই চললেন। অবশেষে খুবসম্ভব আমাদের ভাইজান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা কারো নাম নয়; বরং হিন্দুস্তানী মহিলাদের নামের শুরুতে এটি লেখা হয়ে থাকে। যাইহোক, তার হাজিরা নেয়া দেখে কিছুটা আশা জেগেছিলো যে, এবার হয়তো বিমানে আরোহনের ডাক আসবে। কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত কেউ আমাদের ডাকতে এলো না। সারা রাত এভাবেই ফুরিয়ে গেলো। সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে জানা গেল, বিমান কিছু সময়ের মধ্যেই যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে এবং যাত্রীদেরকে বিমানে যার যার আসনে বসানো হচ্ছে। আব্বাজান রহ. বললেন, এখন বিমানে চড়ার অর্থ হলো, ফজরের নামায কাযা হওয়া। তাই তিনি ইচ্ছে করেই এতোটুকু সময় কালক্ষেপণ করলেন, যাতে ফজরের নামায পড়ে নেয়া যায়। নামাযের পর আমরা বিমানে আরোহন করলাম। এটি ছিলো একটি ছোট 'ডাকোটা বিমান'। এটিই আমার জীবনে প্রথম আকাশ ভ্রমণের ঘটনা ছিল, এজন্য আমি এ ভ্রমণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম।

মদীনা মুনাওয়ারার রানওয়ে তখন পাকা ছিল না; পাথরকুঁচির বানানো ছিল। বিমানের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করতেই রানওয়ে থেকে প্রচুর পাথরকুঁচি ছিটকে উঠতে লাগলো। ফলে বিমান অবতরণ না করে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেল। কিছুটা উঁচুতে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিমানের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করল। কিন্তু এবারও অবতরণ করার পরিবর্তে উপরে উঠে গেলো। এভাবে অন্তত তিন-চারবার হল। এরপর বিমান যমীনে অবতরণ করতে সক্ষম হলো। আমি মনে করেছিলাম, বিমান হয়তো সবসময় এভাবেই অবতরণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে জেনেছিলাম, বিমানে কোন যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল, যার জন্য জরুরী অবস্থাও তৈরি হতে পারতো। আল্লাহ তা'আলার পরম করুণা ছিল যে, তৃতীয় বা চতুর্থ চেষ্টায় বিমান সফলভাবে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নীচে নেমে দেখলাম মদীনা মুনাওয়ারার বিমানবন্দরে একটি ছোট্ট কামরা ছাড়া আর কোন ভবন নেই!

আমার বয়স তখন আট বছর চলছিলো। কিন্তু শুরু থেকেই কচিমনে মদীনা মুনাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দানা বেঁধেছিল এবং এই পবিত্র শহরের হাজিরী যেন একটি সুখস্বপ্ন। সে সময় মসজিদে নববীর (নবীজীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উত্তরের ফটক যেটাকে

‘বাবুল মাজিদী’ বলা হতো সেটা তুর্কি ভবনের প্রথম চত্তরের প্রান্তে ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে মসজিদের দৈর্ঘ্য বর্তমানে দৈর্ঘ্যের তুলনায় টেনেটুনে ছয়ভাগের একভাগ ছিল।

দরজার সামনে সামান্য খোলা অংশের পর একটি সুড়ঙ্গের মত রাস্তা ছিল, যার উভয় পাশে দোকানপাটও ছিলো। এরপর ‘ইসতফা মনযিল’ নামে একটি ভবন ছিল, যা আব্বাজানের একজন বন্ধু, লক্ষ্ণৌ’র দীনদার ব্যবসায়ী হাজী ইসতফা খান সাহেব রহ. হাজী ও দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে অবস্থানের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। আমাদের অবস্থান সেই মনযিলের আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল। এই আন্ডারগ্রাউন্ডের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, এতে একটি কূপ ছিলো। এটি ছিলো সেই কূপ যা হযরত আবূ তালহা আনসারী রাযি.-এর বাগানে অবস্থিত ছিল এবং এটিকে بير حا অথবা بئر طلحة বলা হতো। যখন সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

‘তোমরা কখনো নেককারের মর্যাদা পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ তা‘আলার রাহে খরচ না করবে।’ তখন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সবসময় মুখিয়ে থাকতেন, নেকির একটি সুযোগও যেন তাদের হাতছাড়া না হয়। কাজেই প্রত্যেকে অনুসন্ধানে লেগে গেলেন যে, তাদের নিজের সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোনটি। প্রত্যেক সাহাবী রাযি. নিজের সর্বাধিক পছন্দনীয় সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদকা করতে শুরু করলেন। এ ব্যাপারে বহু ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

(১) সকল রেওয়ায়েতের সবিস্তর আলোচনা মা‘আরিফুল কুরআনের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৮নং পৃষ্ঠায় চতুর্থ পারার প্রথম আয়াতের অধীনে করা হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ তালহা আনসারী রাযি. অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাগান, بير حا আমার কাছে সবচে প্রিয়। আমি চাচ্ছি এই বাগান সদকা করে দেব। তিনি বললেন, ওয়াহ! এই বাগান তো অনেক লাভজনক সম্পদ! আমার রায় হচ্ছে তুমি এটাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনের মাঝে সদকা করে দাও। সুতরাং তিনি এমনটাই করলেন। সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে যে এই বাগানটি মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত ছিল। এই কূপের পানি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পছন্দনীয় ছিল। তিনি আগ্রহভরে এর পানি পান করতেন। এই বরকতময় কূপের পাশে আমাদের দু’বার অবস্থানের সৌভাগ্য হয়েছে এবং এই কূপের বরকতময় পানি পান করে আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। এখন ইসতফা মনযিলের সেই ভবন এবং কূপ মসজিদের সম্প্রসারিত অংশে শামিল হয়ে গেছে।

হযরত আব্বাজান রহ. আমাদেরকে মসজিদে নববীতে নিয়ে গেলেন। মসজিদে নববীর প্রতিটি স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সাথে আমাদেরকে পরিচিত করালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকে হাজিরী এবং সালাম আরয করারও তাওফীক হলো। আমার পুরো স্মরণ নেই, আমরা মোট কতদিন মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলাম। খুবসম্ভব আটদিন হবে। এ সময়ে আব্বাজান রহ. বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত স্থান দর্শনের জন্য আমাদেরকে নিয়ে যেতেন। জান্নাতুল বাকীর পর সর্বপ্রথম আমরা উহুদ প্রান্তর যিয়ারতের জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে উহুদের শহীদানের প্রতি সালাম নিবেদন করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম আব্বাজান, ভাইজান এবং অন্যান্য সফরসঙ্গীরা মিলে অনুমান করছিলেন যে, মুশরিকদের সৈন্যরা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলো আর মুসলমানগণ কোনদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন? আবার যে টিলার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীর বর্ষণকারীদের নিয়োজিত করেছিলেন সেটি কোনটি ছিলো? সেই টিলাকে ‘জাবালুর রুমাত’ বলা হতো। সবাই মিলে এই বিষয়টির তাহকীক করছিলেন যে, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. কোন দিক থেকে এসে আক্রমণ করেছিলেন? কিন্তু নিশ্চিত কোন সমাধান সামনে আসেনি। এ সকল যিয়ারতের মধ্যে আমরা মসজিদে কিবলাতাইন-এও হাজির হলাম। এটি সেই মসজিদ যেখানে প্রথমবারের মতো বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবা শরীফকে কিবলা বানানোর হুকুম এসেছে এবং নামাযের মধ্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফ অভিমুখী হয়ে গেছেন। সে সময় এটি ছোট্ট একটি মসজিদ ছিলো এবং এতে দুটো ছোট ছোট মেহরাব পরস্পর সামনাসামনি ছিলো। একটি মেহরাব উত্তর দিকে ছিল একথা বোঝানোর জন্য যে, নামায বাইতুল মাকদিস অভিমুখী হয়ে শুরু হয়েছিল। আর আরেকটি মেহরাব দক্ষিণ দিকে বাইতুল্লাহ শরীফ অভিমুখী ছিল। এরপর গাযওয়ায়ে আহযাবের স্থানেও হাজির হয়েছিলাম। আমি আমার বড়দের দেখেছি, তারা অনুমান করছিলেন যে, খন্দক কোথায় এবং কোন পর্যন্ত খনন করা হয়ে থাকতে পারে। মসজিদে কোবায়ও হাজির হয়েছি। সে সময় এটিও বেশ ছোট্ট একটি মসজিদ ছিলো। মসজিদের ভেতরে, দেয়ালের বাইরে একটি বিশেষ স্থানে লৌহ ফলক ছিল একথার নিদর্শন হিসেবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গায় ইমামতি করতেন। এবং মসজিদের চত্বরেও একটি ছোট্ট মেহরাব বানানো ছিল। এই মেহরাবের ব্যাপারে বলা হতো, এটিই সেই জায়গা যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী এসে বসে পড়েছিল।

মসজিদে কোবার পশ্চিম দরজার সামনে একটি বাগান ছিল। এই বাগানেই সেই সুপ্রসিদ্ধ কূপ ছিলো, যার আলোচনা হাদীস শরীফে بئر اريس ‘বিরে আরীস’ নামে এসেছে। সহীহ বুখারীতে এই কূপের ব্যাপারে এই রেওয়াত এসেছে–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ...

রেওয়ায়েতের সারমর্ম হচ্ছে, হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. বলেন, একদিন আমি ইচ্ছে করলাম, আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকবো। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেলাম না। উপস্থিত লোকেরা আমাকে একটি বিশেষ স্থানের দিকে ইশারা করে দেখালেন যে, তিনি ওদিকে গেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে ওদিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, তিনি আরীস কূপের নিকট আগমন করেছেন। তিনি ইস্তঞ্জা সেরে উযূ করলেন এবং শেষে তিনি তাঁর পায়ের গোছা মোবারক খুললেন। এরপর তিনি পা মোবারক কূপে ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। হযরত আবূ মুসা আশআরী রাযি. বলেন, আমি বাগানের প্রবেশপথে পৌঁছে স্থির করলাম, আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারোয়ানের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবো। এতক্ষণে হযরত আবূ বকর রাযি. সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এসে দরজা ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? তিনি জবাব দিলেন, 'আবূ বকর।' আমি বললাম, 'একটু অপেক্ষা করুন!' আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলাম, 'আবূ বকর এসেছেন, তিনি ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে আসতে বলো এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।' সুতরাং তিনি ভেতরে আসলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিক ডানদিকে কূপে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। হযরত আবূ মুসা রাযি. বলেন, ফিরে এসে আমি ফের দরজায় বসে পড়লাম। আমি এখানে আসার সময় আমার ভাইকে উযূ করতে দেখে এসেছিলাম। আমি ভাবছিলাম, যদি সে-ও এখানে চলে আসে, অনেক ভালো হবে। (যেনো তার জন্যও ভেতরে আসার অনুমতি নিতে পারি এবং সে-ও জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যায়।)

একটু পর কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়লেন। এবার হযরত উমর রাযি. আসলেন। আমি তার জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি তাকেও অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং সাথে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়ে দিলেন। তিনি এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে কূপে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। ফের হযরত উসমান রাযি. আসলেন। তিনি তাকেও অনুমতি দিলেন এবং বললেন, তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও এবং সেইসাথে একটি পরীক্ষারও, যার সম্মুখীন তিনি হবেন। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'পাশে আর জায়গা নেই, তাই তিনি হুযূরের সামনের দিকে কূপে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. যিনি এই হাদীস হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি এই ঘটনা বয়ান করে বলেন, আমার মতে এই ঘটনায় তাদের দাফনগাহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ হুযূরের ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.-এর কবর তো হুযূরের সঙ্গেই হয়েছে। কিন্তু হযরত উসমান রাযি.-এর কবর তাঁদের সঙ্গে হবে না বরং তাঁদের সামনে জান্নাতুল বাকী'তে হবে। (সহীহ বুখারী, মানাকিব।)

হযরত আব্বাজান রহ. এই কূপের কাছে পৌঁছলে তিনিও কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন। ভাইজানও বসলেন। তাদেরকে অনুসরণ করে আমিও পা ঝুলিয়ে বসলাম।

এই কূপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠিতে সিল দেয়ার জন্য একটি আংটি বানিয়েছিলেন। এটির উপর مُحَمَّد رسول الله 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদাই করা ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এই আংটি হযরত আবূ বকর রাযি.-এর কাছে ছিল। এরপর হযরত উমর রাযি.-এর কাছে। এরপর হযরত উসমান রাযি-এর কাছে। সহীহ বুখারীতে এসেছে, একবার হযরত উসমান রাযি. এই আংটি পরে আরিস কূপের পাড়ে বসে ছিলেন। তিনি হাত থেকে আংটি বের করে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ হাত ফসকে তা কূপে পড়ে যায়। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা তিনদিন পর্যন্ত কূপের ভেতর আংটিটি তালাশ করতে থাকলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পেলাম না। এরপর হযরত উসমান রাযি. কূপের সমস্ত পানি বের করে তালাশ করলেন তবুও পাওয়া গেল না। (সহীহ বুখারী, باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر)

আমি আট বছর বয়সে প্রথমবারের মতো আব্বাজানের সাথে সেই কূপে হাজির হয়েছিলাম। ফের ১৯৬৩ ইং সনে এবং সম্ভবত ১৯৬৪ ইং সনেও সেখানে হাজির হয়েছিলাম। এরপর যখন সেখানে গেলাম, দেখলাম সরকার সেই বাগান ও কূপ মিটিয়ে দিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণ করেছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে বেশ কয়েকবার জান্নাতুল বাকীতেও হাজির হয়েছি। সে সময় জান্নাতুল বাকী সব সময় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকতো। এটাও মনে পড়ছে, আমার একটি দুধের দাঁত ওখানে উপড়ে গিয়েছিল। আম্মাজান বললেন, এই দাঁত জান্নাতুল বাকীতে দাফন করে দাও, যেন তোমার শরীরের অন্তত একটি অংশ জান্নাতুল বাকীতে দাফন হয়ে যায়। সুতরাং আমি পরম আগ্রহে জান্নাতুল বাকীতে মাটি খোদাই করে দাঁতটি দাফন করে দিয়েছিলাম। ছোট্ট বয়সের সেই হজ্জের সফরের এলোমেলো এই কথাগুলোই এখন আমার অল্প-স্বল্প মনে আছে। এরপর ফেরার পথে 'সাফিনায়ে আরব'-এর সফরের কথাও খুব করে মনে আছে। এছাড়াও মাঝ সফরে এসে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান সাহেবের শাহাদাতের দুঃসংবাদ সবাইকে হতবিহ্বল করে দিয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডির কোম্পানীবাগে তাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তারিখ ছিল, ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ ঈসায়ী। এই খবর প্রকাশ পেতেই পুরো জাহাযে শোকের ছায়া নেমে আসলো। সবার চোখেমুখে চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়লো। সেদিন আব্বাজান রহ.-এর চোখেও অশ্রু দেখেছি। হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব রহ.-এর খলীফা হযরত হাজী মুহাম্মদ আফজাল সাহেব রহ.-ও একই জাহাযে আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। এই দুঃসংবাদ যখন এসেছে, তিনি আব্বাজানের পাশেই বসা ছিলেন। তিনিও অশ্রুসিক্ত ছিলেন। তার মুখে বারবার শুধু এই বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিলো, الله تعالى كى مشيت 'আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা!' হযরত আব্বাজান রহ.-ও এই বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করছিলেন। আমার মনে পড়ছে, এই বাক্যটি তখনি আমি প্রথম শুনেছিলাম। এ দুঃসংবাদের পর আমাদের জাহাযের পতাকা কয়েকদিন ধরে অর্ধনমিত ছিল। আর এভাবেই জাহাযটি করাচী বন্দরে এসে নোঙর করে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

হালাল রিযিক : আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিয়ামত

মাওলানা শফীকুর রহমান

পৃথিবীতে আগমনের পর জীবনধারণের জন্য মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রিযিক। রিযিক বলতে আমরা সাধারণত খাদ্য-পানীয় বুঝে থাকি। নিঃসন্দেহে এগুলোও রিযিক; তবে কুরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রিযিকের মর্ম আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক। পৃথিবীতে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যত কিছুর প্রয়োজন হয়, কুরআন-হাদীসে তার সবগুলোকেই রিযিক অভিহিত করা হয়েছে। খাদ্য-পানীয়, বস্ত্র-বাসস্থান, স্বাস্থ্য-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, স্ত্রী-সন্তান, সম্মান-সুখ্যাতি সবকিছুই রিযিক।

রিযিক প্রদান আল্লাহর দায়িত্বে

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু রিযিকের দায়িত্বভার নিজের উপর গ্রহণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

অর্থ: পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্বভার আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেননি। (সূরা হুদ- ৬)

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্টিজীবকে রিযিক প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি হাদীসে পাকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (অর্থ:) সৃষ্টির সময় মাতৃগর্ভে তোমাদের অস্তিত্ব চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রকীট আকারে পড়ে থাকে। তারপর চল্লিশ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। তারপর চল্লিশ দিনে তা একটি গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর ঐ গোশতপিণ্ডের কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত ফেরেশতাকে ঐ গোশতপিণ্ড সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার আদেশ করা হয়– রিযিক, মৃত্যু, আমল, ভাল-মন্দ ভাগ্য। এটা করার পর তার মাঝে রূহ প্রদান করা হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩২০৮)

রিযিক সুনির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ

রোগ-শোকে, অভাব-অনটনে ও হতাশা-ব্যর্থতায় আমরা যে 'হায় কপাল!' বলে আহাজারি করি, হাদীসে বর্ণিত 'ভাল-মন্দ ভাগ্য' দ্বারা সেই 'হায় কপাল!' বোঝানো হয়েছে। সারাটি জীবনব্যাপী আমরা যে রিযিকের জন্যে নিরন্তর দৌড়ে চলছি, এ-ও ঐ ভাগ্যেরই লিখন। কিন্তু সে কথা আমরা খুব কমই স্মরণ রাখি। আর স্মরণ রাখি না বলেই নানারকম পেরেশানী ও হতাশায় জর্জরিত হতে থাকি। আমরা যদি সৃষ্টিলগ্নেই আল্লাহ কর্তৃক আমাদের রিযিক নির্ধারণের কথাটুকু মনে রাখতে পারি, তাহলে রিযিক অন্বেষণের ব্যর্থতাগুলো আমাদের হতাশার কারণ হবে না। আমরা বুঝতে পারব, কেবল চেষ্টাটুকুই আমার করার ছিলো, কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করে ফেলা নয়। সুতরাং যা পাইনি তা ভাগ্যে নেই বলেই পাইনি, আর যা পেয়েছি তা ভাগ্যে ছিল বলেই পেয়েছি। এ ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নলিখিত হাদীসটিও আমাদের জন্য বড় সান্ত্বনার উপকরণ–

إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا

মনে রেখো, কোনো প্রাণীই তার ভাগ্যে লেখা রিযিক পরিপূর্ণভাবে বুঝে পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করবে না; যদিও তা পেতে বিলম্ব হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২১৪৪)

কাজেই একজন মুমিন রিযিক অর্জনের নিয়মতান্ত্রিক মেহনত জারী রাখার পাশাপাশি এই বিশ্বাসও অন্তরে বদ্ধমূল রাখবে যে, তার ভাগ্যে যতটুকু লেখা আছে, তার চেয়ে সামান্যও বেশি সে পাবে না, পেতে পারে না।

উপার্জন-প্রচেষ্টা ও তাওয়াক্কুল দুটোই জরুরী

নিয়মতান্ত্রিক মেহনত জারী রাখার কথাটি বলার কারণ হলো, দুনিয়া দারুল আসবাব অর্থাৎ উপায়-উপকরণের জগৎ। এখানে সবরকম কাজই কোনো না কোনো বাহ্যিক উপকরণের সঙ্গে জড়িত। এটাই সুন্নাতুল্লাহ তথা আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। তাই রিযিকের ব্যাপারে তাকদীরের বিশ্বাসের পাশাপাশি আমাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টাও করে যেতে হবে। এটা শরীয়তেরই নির্দেশ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিযিক উপার্জনকে মর্যাদাপূর্ণ 'ফরয' শব্দে ব্যক্ত করেছেন–

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

(নামায-রোযা জাতীয়) উচ্চস্তরের ফরয (পালন)-এর পর হালাল উপার্জনও ফরয। (সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ১১৬৯৫)

কাজেই শরীয়তের অন্যতম নির্দেশ তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ-ভরসার পাশাপাশি উপার্জনের ফরয দায়িত্বটিও সমানভাবে স্মরণ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য ফরয দায়িত্বে অবহেলা যেমন শরীয়তে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তেমনি উপার্জনের ফরয দায়িত্বে অবহেলা করাও শরীয়তে কাম্য নয়।

বিষয়টি কুরআনে কারীমের নিম্নলিখিত আয়াতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থ: অতঃপর যখন (জুমু'আর) নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে আর আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ করবে। (সূরা জুমু'আ- ১০)

ঠিক একই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তাতেও রিযিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

اللهم إني أسألك من فضلك

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার বিশেষ অনুগ্রহ (রিযিক) কামনা করছি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭১৩)

অনেকে না বুঝে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ-ভরসা এবং রিযিক অন্বেষণের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বিপরীতধর্মী মনে করে। তাদের কাছে রিযিকের জন্য দৌড়ঝাঁপ করা তাওয়াক্কুল-বিরোধী মনে হয়। এটা এক ধরনের অজ্ঞতা। মূলত এ দু'টোতে কোন বৈপরিত্ব নেই;

একই ক্ষেত্রে এবং একই সময়ে উভয়টির সমাবেশ ঘটতে পারে; বরং সমাবে ঘটাতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে–

একবার জনৈক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উট থেকে নামলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উটটি কোথাও বেঁধে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, নাকি না বেঁধেই তাওয়াক্কুল করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগে তুমি উটটি বাঁধো, তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। (জামে তিরমিযী; হা.নং ২৫১৭)

এসব আয়াত ও হাদীস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, ইসলাম মানুষকে অবাস্তব বিশ্বাস ও কর্মের পেছনে ছুটতে বলে না। আমরা বাস্তবতায় বাস করেই পরম সত্য ভালো-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করব। অর্থাৎ তাওয়াক্কুল আমাদের বিশ্বাসের জায়গা, আর রিযিকের জন্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা আমাদের দায়িত্ব। দু'টোই আল্লাহ নির্দেশিত বিধান। একজন খাঁটি মুমিন দুটোকেই পরম যত্নে একসঙ্গে ধারণ করে।

স্বহস্তে উপার্জনের গুরুত্ব

কুরআন-হাদীসে উপার্জনের গুরুত্বের পাশাপাশি নিজ হাতে উপার্জনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

অর্থ: তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে আহার গ্রহণ করো। (সূরা মুলক- ১৫)

হাদীসে পাকে আরো চমৎকারভাবে স্বহস্তে উপার্জিত রিযিকের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (অর্থ:) মানুষের জন্য স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৭২)

আমরা যদি নবী-রাসূলগণের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখতে পাবো, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকে দিয়েই উপার্জনের কাজ করিয়েছেন এবং তাঁরাও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী হালাল উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। নবীদের স্বহস্তে হালাল উপার্জনের কিছু নমুনা লক্ষ্য করুন–

হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের কাজ করে দিয়েছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম লোহার আসবাবপত্র নিজ হাতে তৈরি করে বিক্রি করতেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বহু বছর বকরি চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। স্বয়ং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বকরি চরিয়েছেন, হযরত খাদিজা রাযি.-এর ব্যবসার মহাব্যবস্থাপক হয়ে সুদূর সিরিয়ায় সফর করেছেন।

অপরদিকে বেকারত্ব ও পরনির্ভরতা ইসলামের মেজায-পরিপন্থী। আদতে ইসলামের কোথাও এর সুযোগ রাখা হয়নি। নবী-রাসূলগণের এ স্বভাব-রুচি সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনসহ আমাদের পূর্বসূরীদের সকলেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করতেন।

উপার্জন হতে হবে হালাল

ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য হলো, ইসলাম তার বিধি-বিধানের মাধমে বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। এজন্য ইসলাম জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়নি; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যেন সে কোন ক্ষেত্রেই উক্ত নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন না করে। আর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই ইসলাম আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কটি সচল ও সজীব রাখে।

জীবিকা উপার্জন মানব জীবনের এমন একটি প্রয়োজন, যা প্রত্যেককে আপন আপন স্বার্থের হিসেব কষতে শেখায়। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখার অন্যতম উপায় অর্থনীতির কথাও চলে আসে। সুতরাং উপার্জন ও অর্থনীতির এই জায়গাটিতে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের হস্তক্ষেপের সীমারেখা ও সুন্দরতম কোন নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হলে কোনো ব্যক্তি ও জাতিই আয়-উপার্জনের কোনো একটি পরিমাণে পরিতুষ্ট থাকবে না। আরো চাই আরো চাই-ই হয়ে উঠবে সবার জীবনের একমাত্র সাধনা। ফলে নীতিহীন মানুষের অবাধ লালসা নির্দয়ভাবে কেড়ে নেবে হাজারো মানুষের রুটি-রুজি। গুটিকয়েক মানুষের কাছে পুঞ্জীভূত হবে লক্ষ-কোটি মানুষের সম্মিলিত সম্পদ। এজন্য কুরআন-হাদীস একদিকে যেমন উপার্জনের প্রতি আমাদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহ দিয়েছে, অপরদিকে আমাদেরকে বেঁধে দিয়েছে কিছু সুসংহত নীতিমালায়। যেন এই নিয়ম-নীতির আওতায় থেকেই আমরা খুঁজে নিতে পারি আমাদের বেঁচে থাকার উপায় উপকরণ এবং মানবসমাজে বজায় থাকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য। ইসলামে উপার্জনের এই বিধিবদ্ধ পথটিকেই বলা হয়েছে হালাল আর বিধিবহির্ভূত পথটিকে বলা হয়েছে হারাম।

উপার্জনের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হালাল-হারামের মূলনীতি এই–

এক. উপার্জিত বস্তুটি হালাল হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের সূরা বাকারায় মদ-জুয়ার বিধান আলোচনা প্রসঙ্গে কোন জিনিসটি হালাল তার একটি মূলনীতি বাতলে দিয়েছেন–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থ: হে নবী! লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এ দুটোতে রয়েছে বিরাট পাপ ও অকল্যাণ, আবার মানুষের জন্যে উপকারও। তবে এ সবের পাপের ভয়াবহতা কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি। (সূরা বাকারা- ২১৮)

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি– কোনো বস্তুর হালাল-হারাম নির্ণয়ে কল্যাণ-অকল্যাণের পরিমাণ ও মাত্রা অত্যন্ত সহজ একটি মাপকাঠি। যেখানে কল্যাণের বিপুল উপস্থিতি থাকবে, স্বাভাবিকতই সেটা হালাল হবে। আর যেখানে অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণের উপস্থিতি থাকবে নামমাত্র, স্বাভাবিকতই সেটা হালাল হবে না। হালাল ও হারাম বস্তু নির্ণয়ে এটি একটি মৌলিক বিধান। এর মাধ্যমে ইসলামের হালাল-হারাম

নীতির স্বভাব ও রুচি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে এই মূলনীতি বলেই ছেড়ে দেয়নি; বরং মোটাদাগের হালাল-হারাম বস্তুসমূহকে বাছাইও করে দিয়েছে। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

অর্থ: বলো, আমার কাছে যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তাতে মৃতজন্তু, বহমান রক্ত কিংবা শূকরের মাংস ছাড়া লোকে যা আহার করে তার মধ্যে কোনো হারাম জিনিসই আমি পাই না। কারণ, এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের ফলে অবৈধ। (সূরা আনআম- ১৪৫)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

অর্থ: আমি তোমাদেরকে জীবনোপকরণ হিসেবে যা দিয়েছি, তা থেকে উত্তম ও হালালগুলো খাও। (সূরা ত্ব-হা- ৮৮)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থ: আর তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্যে উত্তম বস্তুসমূহকে হালাল করেছেন আর অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করেছেন। (সূরা আরাফ- ১৫৭)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

র্অথ: আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে যা দিয়েছেন, তা থেকে উত্তমগুলো আহার করো। (সূরা মায়িদা- ৮৮)

দুই. উপার্জনের পন্থাটিও হালাল হওয়া। অনেক ভালো জিনিসও আহরণপদ্ধতির ত্রুটির কারণে ভয়ানক মন্দ জিনিসে পরিণত হয়। রিযিক বিষয়ক হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এটি আরো বাস্তব। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হারাম বস্তুসমূহ যথা: মদ, শূকরের গোস্ত, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির ব্যাপারে তো খুব সতর্ক থাকি। কিন্তু হালাল বস্তু হালাল উপায়ে সংগহ করছি কিনা সে ব্যাপারে থাকি চরম উদাসীন। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে দুটো বিষয়ই সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাটি জীবন উম্মতকে হালাল জিনিস হালাল উপায়ে অর্জন ও আহরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ উপার্জনের প্রক্রিয়াটি শুধু আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত তা-ই নয়, বান্দার হকও এতে জড়িয়ে থাকে নিবিড়ভাবে। এ জন্য কোনো বস্তু হালাল হওয়া সত্ত্বেও তা আহরণ ও উপার্জন করতে গিয়ে যেন শরীয়তনির্দেশিত উপার্জনপন্থা লঙ্ঘিত না হয়, অন্যের অধিকার নষ্ট না হয়, এদিকেও গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, একজনের উপার্জন যেন অন্যের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারণ না হয়। শোষণ, নির্যাতন, লুটপাট, ধোঁকাবাজি, জালিয়াতি, মজুদদারি, কালোবাজারি, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমাদের উপার্জন যেন কলুষিত না হয়– ইসলাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না। হ্যাঁ, পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করলে তা তোমাদের জন্য বৈধ। (সূরা নিসা- ২৯)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না। (সূরা বাকারা- ১৮৮)

সুতরাং উপার্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সম্পদে যেন কোনো ধরনের হারামের অনুপ্রবেশ না ঘটে। হারাম উপার্জনের প্রতি আমি কেনইবা লালায়িত হবো, অথচ আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টন করেই দেয়া আছে এবং আমার ভাগের অংশ অবশ্যই আমি পাবো। হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– (অর্থ:) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক অন্বেষণের পন্থা বৈধ ও সুন্দর করো। সেইসঙ্গে আল্লাহর উপর ভরসাও রাখো। মনে রেখো–কোনো প্রাণীই তার ভাগ্যে লেখা রিযিক না পেয়ে মৃত্যুবরণ করবে না; যদিও তা আসতে বিলম্ব হয়। কাজেই তোমরা আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ করে উপার্জনের পদ্ধতি সুন্দর করো। যা হালাল তা-ই গ্রহণ করো আর যা হারাম তা পরিহার করে চলো। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২১৪৪)

হারাম রিযিকের অশুভ পরিণতি

আমরা আল্লাহ তা'আলার যত রকম ইবাদত-বন্দেগী করি, সবগুলোই একটা কেন্দ্রবিন্দুতে একীভূত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সেই বিন্দুটি হচ্ছে দু'আ। মূলত কোনো ইবাদতই দু'আবিহিন আদায় হয় না। এ কারণেই হাদীসে পাকে দু'আকে সকল ইবাদতের মগজ বা সারবত্তা অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, বান্দার হারাম রিযিকের পরিণতি হলো, তার সকল ইবাদতের সারবত্তা-দু'আ কবুল করা হবে না। একজন মুমিনের জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, তার মালিক তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না! আমাদের চিন্তা করা উচিত, দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য আমি তো এমন কোনো কাজ করে বসছি না, যার কারণে আমার সারা জীবনের আল্লাহপ্রাপ্তির সাধনা ধুলোয় মিশে যাচ্ছে? হাদীস শরীফে বড় হৃদয়গ্রাহী পন্থায় হালাল রিযিকের গুরুত্ব ও হারাম রিযিকের অপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (অর্থ:) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সে নির্দেশই দিয়েছেন। তিনি রাসূলগণকে বলেছিলেন, হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাবার গ্রহণ করুন, তারপর নেককাজ করুন। আর মুমিনদেরকে বলেছেন, হে ঈমানদার বান্দাগণ! আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে পবিত্রগুলোই তোমরা গ্রহণ কর। অতঃপর নবীজী একব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে কিনা দূর-দূরান্ত সফর করে বেড়াচ্ছে, চুলগুলো এলোমেলো, শরীর ধুলোমলিন, আসমানের দিকে হাত তুলে বলে ইয়া রব্ব! ইয়া রব্ব!! কিন্তু কেমন করে তার দু'আ কবুল হবে, যখন তার খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র স-ব হারাম? (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০১৫)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসে উল্লিখিত এই ব্যক্তির মধ্যে দু'আ কবুলের চারটি কারণ বিদ্যমান ছিল, তবুও তার দু'আ কবুল করা হয়নি।

প্রথম কারণ হলো– সে মুসাফির। বিভিন্ন হাদীসে মুসাফিরের দু'আ কবুলের ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কারণ এ সময় আল্লাহর উপরই বান্দা সবচেয়ে বেশি ভরসা করে থাকে। তার অন্তর বিগলিত থাকে। অর্থাৎ খোদ সফরই দু'আ কবুলের অনেক বড় কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো– তার জীর্ণশীর্ণ পোশাক আর ধুলোমলিন শরীর। হাদীসে আছে– জীর্ণপোশাক, শীর্ণদেহ আর এলোচুলো অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে কেউ মূল্যায়ন করে না। সব দরজা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তাদের ভেতরের শক্তি এতোটা মজবুত যে, তারা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোনো বিষয়ে কসম করে বসে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন। সম্ভবত এ কারণেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইস্তেসকার নামাযে বের হতেন, তখন খুবই সাদামাটা পোশাকে বিনয়ের সাথে বের হতেন, যেন আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন।

তৃতীয় কারণ হলো– আসমানের দিকে হাত উঁচিয়ে দু'আ করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ বড় লজ্জাশীল, দয়াময়। যখন তাঁর দিকে কেউ দুই হাত প্রসারিত করে চাইতে থাকে, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

চতুর্থ কারণ হলো– রব্ব (মালিক) শব্দে আল্লাহকে ডাকা। হাদীসে আছে, কোনো বান্দা যখন তার দু'আয় চারবার ইয়া রব্ব! ইয়া রব্ব! বলে ডাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেন, আমি প্রস্তুত, তুমি আমার কাছে যা চাও আমি তাই দেব। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে কুরআন শরীফে তাঁর কাছে দু'আ করার শব্দাবলী শিক্ষা দিয়েছেন, তখন প্রায় অধিকাংশ দু'আই 'রাব্বানা' দিয়ে শুরু করেছেন।

এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো– একজন ব্যক্তি দু'আ কবুলের চার-চারটি শর্তসহ আল্লাহর কাছে দু'আ করছে, কিন্তু আল্লাহ তার ডাক শুনছেন না! নবীজী আমাদেরকে এর কারণটিও বলে দিয়েছেন যে, দু'আ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ তার হারাম উপার্জন ও হারাম গ্রহণ।

সুতরাং একজন মুমিন হিসেবে আমাদের ভেবে দেখা উচিত, জীবনে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের পাবন্দি তো করছি, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে আমার রিযিক হালাল আছে কিনা তার কি কখনো খোঁজ করেছি? কেয়ামতের কঠিনতম দিনে আমাদেরকে যে পাঁচ প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে, তার একটি থাকবে– রিযিক কোত্থেকে কীভাবে উপার্জন করেছি। অর্থাৎ হালাল বস্তু হালাল পদ্ধতিতে, নাকি হারাম বস্তু হারাম উপায়ে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমাতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
হাউজ # ৩/৩/১৫, রোড # ৪
চাঁনমিয়া হাউজিং, বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৬৭১০৭১১, ০১৮৭৬০০৩৫১৮

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৪১২

বাংলার ইসলামী রেনেসাঁর সেনানায়ক, বিংশ শতাব্দির কিংবদন্তী, দাওয়াতী মেহনতের গোড়াপত্তনকারী

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.

মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকার বুকে

হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ঢাকায় এসে বাদামতলী ঘাটের অদূরে নলগোলা মসজিদে উঠলেন। সেখানে শুরু করলেন লেখাপড়ার কার্যক্রম। কিছুটা অসুবিধা দেখা দিলে চলে এলেন লোহারপুল সংলগ্ন মসজিদে। মহল্লার মসজিদে আবাসিক মাদরাসা চালানো মুশকিল, তাই স্থায়ী জায়গার চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বুড়িগঙ্গার অপর প্রান্তে জিঞ্জিরার এক মসজিদে তাফসীর শুরু করলেন।

হাফেয হুসাইন সাহেব। নামকরা ব্যবসায়ী ধার্মিক ও দানশীল। মাঝে মাঝে তাফসীরে বসেন। মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনেন। বিমুগ্ধ হন। এবার পরীক্ষা নেয়ার পালা। সদর সাহেবের হাতে ২২ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এটা যাকাতের; আপনি গরীব মানুষ, নিজ প্রয়োজনে খরচ করবেন। সদর সাহেব সহাস্যবদনে এই দান প্রত্যাখ্যান করলেন। হুসাইন সাহেবের ইচ্ছা ছিল বড় কাটারার কেল্লায় একটি মাদরাসা করা। অনেককে দায়িত্ব দিয়েছেন। টাকা পয়সা খরচ করেছেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল আসেনি। তিনি কেল্লাটি সদর সাহেবকে দিয়ে দিলেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য।

বড় কাটারার কেল্লা মোগলদের শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার জীবন্ত নিদর্শন হয়ে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে কালপরিক্রমায় তখন তা ময়লার স্তুপ। জটাধারী ভণ্ড-ফকিরদের আস্তানা। ১৯৩৬ সালে হাফেয হুসাইন সাহেব রহ.-এর নাম মিলিয়ে হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসা নামে নবযাত্রা। চারিদিকে হিদায়াতের নির্মল দ্যুতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঢাকাবাসীর প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো বড় কাটারা। হযরত সদর সাহেব পরিকল্পিতভাবে চারিদিকে বয়ান তাফসীর করতে লাগলেন আর মসজিদ-মকতব প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আর সেখানে ইমাম, শিক্ষক হিসেবে বড় কাটারার ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে লাগলেন। তাদের আদব-আখলাকে বিমুগ্ধ হয়ে শিরক-বিদআতের অবসান ঘটলো। ঢাকা শহর আলোকিত শহরে রূপান্তরিত হতে লাগলো।

গওহরডাঙ্গা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

সদর সাহেবের ইচ্ছা ছিল নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু নিজে এলাকায় থাকেন না। আর এই অজোপাড়া গাঁয়ে কোনো যোগ্য লোকও পাচ্ছেন না। ১৯৩৭ সালের কথা। সদর সাহেবের স্নেহধন্য ছাত্র নাজিরপুরের মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব দু'আর জন্য আসলে তার কাছে মনের তামান্না ব্যক্ত করলেন। তিনি সম্মতি প্রকাশ করলেন। মাসিক বেতন ধার্য হলো মাত্র ৫ টাকা। তাও পুরাটা উসুল হয় না। কোন মাসে চারআনা, কোন মাসে পাঁচআনা। সদর সাহেবের বাড়ির মসজিদে নূরানী মকতবের মাধ্যমে মাদরাসা আরম্ভ হল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নিঝুম পল্লীতে আজ সেই নূরানী মকতব দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি দীনী প্রতিষ্ঠান। এখাই মসজিদের কোণ ঘেঁষে হিফয বিভাগ ও দারুল হাদীস সংলগ্ন নারকেল বৃক্ষের ছায়াঢাকা এক জান্নাতের বাগানে চির শায়িত আছেন মুজাহিদে আযম রহ.।

জামি'আ কুরআনিয়া লালবাগ

বড় কাটারার লাল ইটের জীর্ণ কেল্লায় অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে সুদীর্ঘ বাইশ বছর অতিবাহিত করলেন সদর সাহেব, হাফেজ্জী হুযূর ও পীরজী হুযূর রহ.। অবিরাম দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন; যেন এক আত্মার তিন দেহ। পীরজি হুযূর মুহতামিম, সদর সাহেব সদরুল মুদাররিসীন। বড় কাটারার পড়া-লেখা তখন জমজমাট। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা ছিলো ভিন্নরকম। সদর সাহেব হুযূর বড় কাটারা ছেড়ে চলে এলেন ঢাকার জিঞ্জিরা এলাকায়।

একদিন উর্দূভাষী কিছু লোক এসে সদর সাহেবকে বললেন, আপনি লালবাগে মাদরাসা করুন; আমরা সহযোগিতা করব। হাফেজ্জী হুযূর রহ. তখন লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম। তিনিও সদর সাহেবকে বারবার একথা বললেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। একরাতে সদর সাহেব স্বপ্নে দেখলেন, লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে অনেক লোক সমাগম। পিপাসার্ত মানুষ যেন কার অপেক্ষায় এদিক ওদিক ফিরে তাকাচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। নিজ হাতে সবাইকে শরবত পান করালেন। সদর সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। এতদিন তিনি যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন, আজ কুদরতী ইশারায় মনস্থির করলেন যে, লালবাগ শাহী মসজিদ কেন্দ্রিক দীনের মারকায গড়তে হবে। বড় কাটারা আর যাওয়া হবে না। এরপর তিনি লালবাগ চলে এলেন। সাথে এলেন হাফেজ্জী হুযূর, মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর, মুফতী আবদুল মুঈয সাহেব ঢাকুবী হুযূরসহ আরো অনেকে।

১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ। ঢাকার বুকে তিনিই প্রথম জামি'আ শব্দ ব্যবহার করলেন। এ সকল মনীষীর মহব্বতে বাংলার দিকদিগন্ত হতে ছুটে এলো শত-সহস্র তালিবে ইলম। হযরত যফর আহমদ উসমানী রহ.-ও বুখারীর দরস দিতে আরম্ভ করলেন। শুরু হলো নবউদ্যমে ঐতিহ্যের পথচলা। হযরত সদর সাহেব প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম। আমৃত্যু তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম মোস্তফাগঞ্জ। এই গ্রামের এক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান বিখ্যাত আলেম মাওলানা আজিজুর রহমান। তিনি তখন লালবাগের ছাত্র। এলাকার লোকেরা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করল। মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব ওয়াজের জন্য সদর সাহেব হুযূরসহ আরো কয়েকজনকে দাওয়াত করলেন। সদর সাহেব হুযূর মানুষের হৃদয়রাজ্যে স্বর্গীয় ঝড় তোলা এক ওয়াজ করলেন। সবাই দারুণ মুগ্ধ হলো। বিগত জীবনের অনুশোচনায় অশ্রুধারা নেমে এলো। বিদায়ের সময় এলাকার মুরুব্বীগণ সদর সাহেবকে তিনশত টাকা হাদিয়া পেশ করলেন। তিনি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, দিনের কাজের সামর্থ্য থাকলে রাহ-খরচ নিজেকে দিতে হয়, অপারগ হলে শুধু খরচ নিতে পারে। তাই আমি লঞ্চ ভাড়া বাবদ কেবল দেড় টাকা নিতে পারি; এর বেশি নয়। আমি ক্ষুদ্র মানুষ; হাদিয়া গ্রহণের উপযুক্ত নই। একথা শুনে সবাই নীরবে কাঁদতে লাগলেন। তাদের আন্তরিকতা দেখে সদর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের এলাকায় কি কোন মাদরাসা আছে? না নেই। আপনারা কি মাদরাসা কায়েম করতে প্রস্তুত আছেন। হ্যাঁ, প্রস্তুত আছি। সদর সাহেব তখন বললেন, আমি আপনাদের হাদিয়া কবুল করলাম এবং মাদরাসা বানানোর জন্য দান করলাম। আপনারাও মুক্তহস্তে দান করুন। আজিজুর রহমান সাহেবকে দায়িত্ব দিলেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অল্প দিনেই তা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

ফরিদাবাদ মাদরাসা

ঢাকার পূর্ব প্রান্তে তখন কোন মাদরাসা ছিল না। সদর সাহেবের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ওই এলাকায় একটি মাদরাসা করার। ১৯৫৬ সালে আল্লাহ তা'আলা গায়েবীভাবে সেই আশা পূরণ করলেন।

ওয়াসেল মোল্লা পুরান ঢাকার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সদর সাহেবের সাথে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। সেই সুবাদে মোল্লাজীর ছেলেরা সবাই সদর সাহেবকে চাচাজী বলে ডাকে। অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। ওয়াসেল মোল্লা মারা গেলে বড় ছেলে কবীর মোল্লা পিতার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখ-ভাল করে। ঢাকার আশেপাশে অনেক জমিজমা ক্রয় করে রেখেছে শিল্প কারখানা করার জন্য। কে বা কার প্ররোচনায় হঠাৎ কি ভূত চেপে বসল তার মাথায়– সিনেমা হল তৈরি করবে। মাওলানা শাকের মুহাম্মাদ সাহেব বলেন, আমি তখন নিচের দিকে পড়ি। সদর সাহেবের খাদেম ছিলাম। একদিন একলোক এসে বলল, হুযূর! ওয়াসেল মোল্লার ছেলে কবীর মোল্লা আপনাকে চাচাজী চাচাজী করে ডাকে, আর এখন সে কি করছে জানেন? সে ফরিদাবাদে পাঁচ বিঘা জমি ক্রয় করেছে সিনেমা হল তৈরি করার জন্য। সদর সাহেব একেবারে থ বনে গেলেন। বিষণ্নতায় ভরা কণ্ঠে বললেন, তাহলে কবীর মোল্লাকে আমার সাথে দেখা করতে বলো। দশদিন পার হয়ে যাচ্ছে তার কোনো পাত্তা নেই।

এদিকে সদর সাহেবের ডাক কানে পড়তেই কবীর মোল্লার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। রূহানী প্রভাব তাকে গ্রাস করে ফেলল। হায় হায়! চাচাজী জেনে ফেলেছেন! না জানি, কি সর্বনাশ হয়ে যায়। একদিন এসে হাজির কবীর মোল্লা। অবনত মস্তকে সামনে বসল। সদর সাহেব বললেন, কি মিয়া আসতে বেশ দেরি করে ফেললে যে! হাতে থাকা ফাইল থেকে একটি দলীল বের করে বলল, আপনি কেন ডেকেছেন আমি বুঝতে পেরেছি। তারপর থেকে আমার মাঝে ভয় ও অস্থিরতা কাজ করছে। তাই আমি স্থির করলাম জমিটি আর আমার প্রয়োজন নেই। আপনার নামে দলীল করে দিয়েছি। এই নিন দলিল। এটা প্রস্তুত করতে বিলম্ব হয়ে গেছে। এটা আপনার ব্যক্তিগত সম্পদ; যা ইচ্ছা করতে পারেন। সদর সাহেব আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং পুরা জায়গাটা মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। দাদাপীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর নামে নামকরণ করলেন জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, যা আয়তন এবং ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ঢাকার শীর্ষ এবং দেশের অন্যতম দীনী প্রতিষ্ঠান। সদর সাহেব আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। পরবর্তীর জন্য নিয়ম করে যান লালবাগ জামি'আর চলমান মুহতামিম হবেন ফরিদাবাদের মুতাওয়াল্লী। সে বিধান মোতাবেক হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রহ.-ও ফরিদাবাদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন।

কমলাপুর মাদরাসা

খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবনের কোলঘেঁষা সমুদ্র তীরবর্তী লোনাপানির জনপদ অবিভক্ত পাইকগাছা কয়রা অঞ্চল। শিক্ষার আলো-বঞ্চিত হতদরিদ্র এই এলাকার মানুষ। না আছে সভ্যতা-সংস্কৃতির ছোঁয়া, না আছে ধর্মীয় ন্যূনতম জ্ঞানচর্চা। হযরত সদর সাহেব রহ. হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করলেন, আমার মন চায় ঐ অবহেলিত জনপদে একটি দীনী প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে, কিন্তু কে সেই হেরার রাহী, যে ঐ নোনা মাটি আবাদ করবে?

মাওলানা আবুল হাসান। গওহরডাঙ্গা মাদরাসার ফারেগ একজন তরুণ আলেম। বাগেরহাটের গাংনীর সন্তান (পরবর্তীতে গাংনী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম) তিনি লাব্বাইক বললেন। খাল-বিল, নদী-নালা, ঝোঁপ-ঝাড় পেরিয়ে বেছে নিলেন পাইকগাছা থানার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামকে। মাদরাসা শুরু করবেন; কিন্তু ছাত্র নেই। বাড়ি থেকে ধরে ধরে এনে বাচ্চাদেরকে পড়াতে আরম্ভ করলেন।

১৯৬৬ সনে মাদরাসার গোড়াপত্তন হল। সদর সাহেবের মিশন অনুসারে নাম রাখলেন কমলাপুর খাদিমুল ইসলাম মাদরাসা (বর্তমানে জামি'আ আরাবিয়া খাদিমুল ইসলাম)। এই মাদরাসার প্রথম ছাত্র বর্তমান বাংলার দুর্লভ রত্ন শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.। বর্তমানে মাদরাসাটি দক্ষিণ খুলনার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মুতাওয়াল্লী আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. বলেন, শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর দিলের একটি আহ্ শব্দের ফসল কমলাপুর

মাদরাসা এবং সদর সাহেবের রূহানী তাওয়াজ্জুহ আমাকে আজ এই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সদর সাহেবের সেই অন্তর্দৃষ্টির ফসল কমলাপুর মাদরাসার প্রথম ছাত্র কিশোর মনসূরুল হক লালিত হয়েছেন সদর সাহেবের আদর্শের পরিবেশে। কমলাপুর থেকে এলেন তারই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খুলনা দারুল উলূমে। সেখান থেকে গওহরডাঙ্গায়। সেখান থেকে প্রাণকেন্দ্র লালবাগে। তাই মুজাহিদে আযমের চেতনায় শাণিত হয়ে মুফতী মনসূরুল হক আজ ফাতাওয়ার ময়দানে একজন বিদগ্ধ ফকীহ, হাদীসের মসনদে শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, লিখনীর ময়দানে প্রাজ্ঞ লেখক, দাওয়াত ও তাবলীগের অতন্দ্র প্রহরী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন এক নির্মোহ ব্যক্তিত্ব। মোটকথা তিনি আজ শামসুল হক ফরিদপুরীর রেখে যাওয়া মিশনের প্রতিটি অঙ্গনে যুগের মুজাহিদে আযমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম প্রতিষ্ঠা

১৯৬০ সালের কথা। পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পপতি লতীফ বাওয়ানী ও ইয়াহইয়া বাওয়ানী। সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সদর সাহেবের দু'আ নিতে। বললেন, আমরা একটি সুন্দর জায়গা ক্রয় করেছিলাম অত্যাধুনিক শপিং মল নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু সরকার জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা জমির ধারে কাছেও যেতে পারছি না। আমাদের কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। তাই আপনার খাস দু'আ চাই। সদর সাহেব হুযূর ধমকের সুরে বললেন, আপনারা বার্মায় অনেক কিছু করেছেন, শেষ পর্যন্ত সব ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এখন এদেশেও করছেন, এসব ফেলেও পালাতে হবে। কারণ আপনারা আল্লাহর দীনের জন্য কিছুই করেননি। বিনয়ের সাথে তারা বলল, হুযূর! এখন আপনি যে পরামর্শ দেন আমরা মানতে বদ্ধপরিকর। সদর সাহেব বললেন, আমার পরামর্শ যদি মানেন, তাহলে দুনিয়াতেও জমি বেহাত হবে না আর আখেরাতেও লাভবান হবেন। আপনারা অনেক লোক লাগিয়ে রাতারাতি টিন দিয়ে ঘেরাও করে ফেলুন। তারপর সাথে সাথে ইট-বালু দিয়ে একটি মসজিদের ভিত্তি করে ফেলুন। বাকি কাজ আমার দায়িত্বে।

তারা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাতারাতি এসব কাজ করে ফেলল। পরদিন সরকারি লোকজন সংবাদ পেয়ে উচ্ছেদ করতে এলে জানতে পারল এটা শামসুল হক ফরিদপুরীর কাজ। তারা পিছপা হয়ে গেল। সদর সাহেবের কাজে বাধা দেয়ার সাহস হলো না। উপরন্তু সরকারিভাবে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলো।

১৯৬০ সালের ২৭ মে পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এসে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করলেন। নাম রাখলেন বাইতুল মুকাররম, যা আজ বাংলার জাতীয় মসজিদ, আমাদের গর্বের স্থাপত্য।

বাংলার জমিনে দাওয়াতী মেহনতের গোড়াপত্তন

হযরত সদর সাহেব রহ.-এর হাতেই পূর্ববাংলায় দাওয়াত ও তাবলীগের ঈমানী মেহনতের গোড়াপত্তন হয় এবং আজীবন তিনি ছিলেন এই মেহনতের বাংলাদেশের প্রধান অভিভাবক। গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সিদ্ধান্ত তার মতানুসারে হত।

গোড়ার কথা। হযরত ইলিয়াস রহ. দাওয়াতী মেহনতে হযরত থানবী রহ.-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। থানবী রহ. উলামা-খাওয়াসদের ইসলাহের ফিকির করতেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের হিদায়াতের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন। চিন্তায় মগ্ন থাকতেন– কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর এই মেহনতের তরতীব দেখে থানবী রহ. মন্তব্য করেছিলেন,

الیاس نے میرے یاس کو آس سے بدل دیا

অর্থাৎ মাওলানা ইলিয়াস আমার নিরাশাকে আশায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের কাজ চালু হলেও বাংলা অঞ্চলে তখনো নিয়মতান্ত্রিক কোন কাজ আরম্ভ হয়নি। ইলিয়াস রহ. থানবী রহ.-কে বলেছিলেন, বাংলা অঞ্চলে আপনার অনেক শাগরিদ আছে; একজন যোগ্য কর্মঠ লোক দেন এই দাওয়াতী মেহনতের হাল ধরার জন্য। এরপরের রমাযানে সদর সাহেব থানাভবনে গেলে থানবী রহ. তাকে হযরতজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে বললেন। সদর সাহেব নিজামুদ্দীন চলে গেলেন। মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আপনাকে বাংলাদেশের দাওয়াতী মেহনতের দায়িত্ব নিতে হবে। সদর সাহেব সম্মতি জ্ঞাপন করে ফিরে এলেন। তবে তিনি ছিলেন নানামুখী দীনী কাজে লিপ্ত। তাই এ কাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক মুখলিস লোকের খোঁজে ছিলেন। সদর সাহেব একবার প্রোগ্রামে গেলেন মোল্লাহাটের উদয়পুর মাদরাসায়। বিখ্যাত পীর মাওলানা আব্দুল হালিম সাহেব মাদরাসার মুহতামিম। হঠাৎ সদর সাহেবের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিপতিত হলো মাদরাসার নবীন উস্তাদ, নিষ্কলুষ অবয়ব, পীর সাহেবের জামাতা মাওলানা আব্দুল আজিজ খুলনাবীর উপর। প্রতিভাবান কর্মী নির্বাচন করে যথাযোগ্য খেদমতে লাগানো ছিল হযরত সদর সাহেবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। একনজরে সব পরখ করে নিলেন। পীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে তাবলীগের কাজের জন্য তাকে মনোনীত করলেন। হযরত ইলিয়াস রহ. ঐ বছর ইন্তেকাল করেন। কাজ শেখার জন্য আব্দুল আজিজ সাহেবকে প্রথমে কলকাতা পরে দ্বিতীয় হজরতজী ইউসুফ রহ.-এর সান্নিধ্যে পাঠান। মেওয়াতসহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় লাগিয়ে তিনি এ কাজ রপ্ত করে আসেন।

উদয়পুরে উদিত হলো দাওয়াতি সূর্য

দেশে ফিরে তিনি উদয়পুর মাদরাসা-মসজিদকে কেন্দ্র বানিয়ে কাজ শুরু করেন। পীর সাহেব কাজের তরতীব ও নগদ ফায়দা উপলব্ধি করে আব্দুল আজিজ সাহেবকে শুধু দাওয়াতের কাজের জন্যই ফারেগ করে দেন। সদর সাহেব আর পীর সাহেব দু'জনে মশওয়ারাক্রমে আব্দুল আজিজ সাহেবকে আমির নিযুক্ত করেছেন। সেই থেকে আজীবন তিনি ছিলেন এ কাজের আমির। আর সদর সাহেব

ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নীতিনির্ধারক। মাদরাসার ভিতরে মারকায পরিচালনায় তা'লীমী কাজে কিছুটা বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই সদর সাহেবের পরামর্শক্রমে দ্বিতীয় মারকাজ করা হলো তেরখাদা থানার বামনডাঙ্গা আব্দুল আজিজ সাহেবের গ্রামে। সেখানে আঞ্চলিক ইজতেমা হত। সদর সাহেব ইজতেমায় এবং পরবর্তী মশওয়ারায় শরীক থাকতেন। পাঁচ বছর পর সদর সাহেব ইজতেমা পরবর্তী এক মশওয়ারায় বললেন, গ্রামে মারকায হয় না। খুলনা শহরে চলে আসো। মুসলমানপাড়ার তালাবওয়ালী মসজিদের মুতাওয়াল্লীর সাথে সদর সাহেব কথা বলে সেটাকে তৃতীয় মারকাজ নির্ধারণ করলেন। সাথে একটি মাদরাসাও করলেন, যা আজ জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম খুলনা নামে পরিচিত। খুলনার এক ইজতেমায় হজরতজী ইউসুফ রহ. তাশরীফ আনলেন। মশওয়ারায় সদর সাহেব বললেন, মিয়া আব্দুল আজিজ! দেহ এক স্থানে আর আত্মা আরেক স্থানে। এভাবে কাজে বরকত হয় না। তাছাড়া দেশব্যাপী কাজ করতে চাইলে ঢাকায় মারকায থাকতে হবে। তাই তুমি লালবাগ শাহী মসজিদে চলে এসো। এটা হল ঢাকার প্রথম আর দেশের চতুর্থ মারকায। অল্পদিনের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়লো। লোক সমাগম বাড়তে লাগলো। জোড়-ইজতেমায় স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সদর সাহেব বললেন, মাঠ সংলগ্ন কোন মসজিদ দেখার জন্য। কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকের খান মুহাম্মাদ মসজিদকে পঞ্চম মারকাজ নির্ধারণ করা হলো।

কয়েক বছর যেতে না যেতেই সেই একই সমস্যা– মাঠে জায়গা হয় না। মশওয়ারায় সদর সাহেব বললেন, শহরের ভিতরে বড় মাঠ সংলগ্ন কোন মসজিদ খোঁজ করতে। তখন রমনা পার্ক হয়নি। গাছপালাহীন বিশাল ফাঁকা ময়দান। পূর্বদিকে মুঘল আমলের তৈরি ছোট পরিসরের মালওয়ালী মসজিদ। সদর সাহেব এটাকে নির্বাচন করলেন। আর বললেন, প্রয়োজনে মাঠের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যাবে। সেটি আজ কেন্দ্রীয় মারকায ঐতিহাসিক কাকরাইল মসজিদ। ছয় উসূলের মেহনতের ষষ্ঠ মারকায হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। সদর সাহেব রহ. যতদিন হায়াতে ছিলেন নিয়মিত কাকরাইলে যাতায়াত ছিলো। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন।

কাকরাইলের রোজনামচা

সদর সাহেবের বড় সাহেবজাদা হাফেয মাওলানা উমর আহমাদ সাহেব রহ. বলেন, ১৯৬৬ সালের কথা। সদর সাহেবের ইন্তেকালের ৩ বছর আগে কাকরাইলের মাঠে সর্বপ্রথম ইজতেমা হয়। হযরত ইউসুফ রহ. তাশরীফ আনলেন। এটিই ছিল তাঁর সর্বশেষ ঢাকা সফর। আব্বাজী সদর সাহেব কাকরাইলে অবস্থান করছিলেন। এদিকে আমার ভগ্নিপতি সদর সাহেবের জামাতা পরবর্তীকালে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব কাশিয়ানী হুযূর যাচ্ছেন করাচিতে হযরত বিন্নুরী রহ.-এর কাছে। আব্বাজীর থেকে বিদায় ও দু'আ নেয়ার জন্য আমাকে নিয়ে তিনি কাকরাইলে গেলেন। কাসেমী হুযূর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আর আমি কাকরাইলে আব্বার কাছে থেকে গেলাম। কাকরাইলে বসে আমি আব্বাজীকে বললাম, আমার একটি ব্যাগ কিনতে হবে। তিনি আমাকে টাকা দিলেন। ইসলামপুর গিয়ে একটি সুন্দর চামড়ার ব্যাগ কিনে কাকরাইল এসে আব্বাজীকে দেখালাম। তিনি বললেন, টাকা দিয়ে চোর কিনে এনেছ অর্থাৎ তোমার ব্যাগে তেমন মূল্যবান কিছু না থাকলেও চোর তোমার পিছু নেবে। একথা শুনে আমি ব্যাগটি আমার মামাকে দিয়ে দিলাম। এভাবে তিনি তাবলীগের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মারকাযের কুতুবখানায় এখনো যে সকল দুষ্প্রাপ্য কিতাব রয়েছে তা সদর সাহেবের সংগৃহীত।

নূরানী পদ্ধতির মূল প্রেরণা

নূরানী পদ্ধতির আবিষ্কারক কারী বেলায়েত সাহেব রহ. বলেন, ফারেগ হওয়ার পর সদর সাহেব আমাকে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার উস্তাদ বানান। আমি সদর সাহেবের দিকনির্দেশনা মোতাবেক নতুনভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ইবতেদায়ী কিতাবাদি পড়াতাম। তাতে ছাত্ররা কঠিন সবক অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারে। এরপর তিনি দিকনির্দেশনা দিলেন মকতবের বাচ্চাদেরকে সহজে কুরআন শেখানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করতে। তার তাগিদে এবং অনুপ্রেরণায় নূরানী তা'লীমুল কুরআন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করি।

সেই মহান সাধক দেশ ও জাতির দরদী অভিভাবক আজ আমাদের মাঝে নেই। ১৯৬৯ সালে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তার জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম। তার জীবন ও কর্ম অনেক সমৃদ্ধ। মানবেতিহাসের বর্ণিল আকাশে এক ধ্রুবতারা। যা আমাদের জীবন সমৃদ্ধির অনুপ্রেরণা।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব, শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল : rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাবাশায় হিজরত : দীনের খাতিরে জন্মভূমি ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মাওলানা মাহমূদুল হাসান ফরিদপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাবশা হিজরতঃ দীনের খাতিরে জন্মভূমি ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ঈমান ও ইসলামের আলো যখন অন্তরের কুফর ও জাহিলিয়্যাতের পর্দা বিদীর্ণ করলো, তখন মুমিন সাহাবায়ে কেরাম এ নেয়ামতের যথাযথ সংরক্ষণের বিনিময়ে নিজের জান, মাল এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন! এ কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, কাফের-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের দরুন ঈমান ও ইসলামের এ নেয়ামতের সংরক্ষণ সাহাবায়ে কেরামের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে হাবশা অভিমুখে হিজরতের নির্দেশ প্রদান করে বললেন,

لو خرجتم إلى أرض الحبشة؟ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق – حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه

যদি তোমরা হাবশায় চলে যেতে! (এবং সেখানে ততদিন অবস্থান করতে) যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বর্তমান কষ্ট থেকে মুক্তির কোনো উপায় বের করে দেন। সেখানে একজন বাদশাহ আছেন, যার কাছে কেউ নির্যাতিত হয় না। আর সে ভূমি হলো সত্যের ভূমি!

যদিও কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের দরুন সাহাবায়ে কেরামের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিলো, তদুপরি তারা শান্তিময় জীবনের প্রত্যাশায় নয়; বরং নিজ ঈমান ও ইসলামের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালনের প্রত্যাশায় নবীজীর নির্দেশে হাবশা অভিমুখে হিজরত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে দীনের খাতিরে জন্মভূমি ত্যাগের এটাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত!

হিজরতের জন্য হাবাশা'র ভূমিকে নির্বাচন করার হেকমত হলো, হাবাশা মক্কার কুরাইশদের প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র ছিলো। সেখানকার বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে 'নাজাশী' বলা হতো (*নাজ্জাশী উচ্চারণ সঠিক নয়*)। তৎকালীন নাজাশী বাদশাহ ছিলেন 'আসহামা' নামক একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। কুরাইশদের ব্যবসাকেন্দ্র হওয়ার সুবাদে আসহামার ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিলো। এ কারণেই নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে হাবাশা অভিমুখে হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩/৭১-৭২, শিবলী নুমানী কৃত সীরাতুন্নবী ১/১৫১, তাজুল আরূস ফী শরহিল কামূস ১৭/৪০৪ মাকতাবায়ে শামেলা)

নবীজীর নির্দেশ পেয়ে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত[১] বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর নেতৃত্বে নবুওয়াতের পঞ্চমবর্ষে রজব মাসে হাবাশা অভিমুখে হিজরত করেন। সূচনা হলো ঈমান ও ইসলামের খাতিরে জন্মভূমি ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম এ হিজরতে যে সকল বরেণ্য সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন–

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি., হযরত উসমানের স্ত্রী নবীজীর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা রাযি., হযরত আবূ হুযাইফা রাযি. এবং তার স্ত্রী হযরত সাহলা বিনতে সুহাইল রাযি., হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি., হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি., হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি., হযরত আবূ সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ রাযি. এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাযি. (যিনি পরবর্তীকালে হযরত আবূ সালামার ইন্তেকালের পর 'উম্মুল মুমিনীন' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।), হযরত উসমান ইবনে মাযঊন রাযি., হযরত আমের ইবনে রবী'আ রাযি. এবং তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবী হুসমা রাযি., হযরত আবূ সাবরা বিনতে আবী রুহম রাযি., হযরত সুহাইল ইবনে বাইযা রাযি., হযরত হাতেব ইবনে আমর রাযি.।

এ সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হিজরতের উদ্দেশ্যে স্ত্রীসহ সর্বপ্রথম যিনি বের হন, তিনি নবীজীর জামাতা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.। নবীজী তার হিজরতের কথা শুনে বললেন,

إنهما لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام

হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূত আ.-এর পরে তারা [স্বামী-স্ত্রী] উভয়ে একসাথে সর্বপ্রথম হিজরতকারী! (মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬৮৪৯, বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল বারী ৭/১৮৮ বাবু হিজরতিল হাবাশা, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৭২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১২২, সীরাতুন্নবী ১/১৫২)

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া : নবুয়তের সুস্পষ্ট মু'জিযা

হাবশায় হিজরতের পরবর্তী সময়েও মক্কার কাফেররা যথারীতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্নভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। সে হিসেবে একদিন তারা মীনায় নবীজীর কাছে এসে বলল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও!' সময়টি ছিলো চতুর্দশীর আলোকিত পূর্ণিমার রাত। নবীজী

১. হাবাশা অভিমুখে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের উল্লিখিত সংখ্যাটি ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক রহ.-এর বর্ণনা। ইমাম ওয়াকিদী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.-এর নামও হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের নামের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। সে হিসেবে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা হয় ১২ জন। তবে আল্লামা ইবনে ইসহাক রহ.-এর মতে হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. হাবশার প্রথম হিজরতে নয়; বরং দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রহ. ও হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ইবনে ইসহাকের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারো কারো মতে সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আমর রাযি.-এর হিজরতে অংশগ্রহণের বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। সে হিসেবে কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ১০ বলেছেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, إن فعلت تؤمنوا؟ *যদি আমি* তা করে দেখাই, তবে কি তোমরা ঈমান আনয়ন করবে? তারা উত্তরে বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা ঈমান আনয়ন করবো। এরপর নবীজী আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন। তৎক্ষণাৎ চুতর্দশী চাঁদটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে হেরা পর্বতের দু’দিকে আকাশের প্রান্তসীমায় পড়ে গেল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, চাঁদটি এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত হলো যে, আমি পাহাড়কে (নূর পাহাড়, যাতে হেরা গুহা রয়েছে) দ্বিখণ্ডিত চাঁদের মাঝখানে দেখতে পেলাম! কোনো কোনো বর্ণনায় এমনও রয়েছে যে, দ্বিখণ্ডিত চাঁদের একটি অংশ আবূ কুবাইস পাহাড়ের প্রান্তে এবং অপর অংশ কুআইকি‘আন পাহাড়ের প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো।

নবীজীর এ মু’জিযা দেখে মুমিনদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীতে হঠকারী কাফেররা এক অদ্ভূত দাবী করলো যে, তাদেরকে যাদু করা হয়েছে! কাজেই দূর-দূরান্তের মুসাফির কাফেলা নিশ্চয় নবীজীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে! কিন্তু সত্যের এ মু’জিযা সকলেই অবলোকন করেছিলো। ফলে দূর-দূরান্তের মুসাফির কাফেলার লোকেরা এসেও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সাক্ষ্য দিলো। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এতদ্বসত্ত্বেও কাফেরদের অন্তরদৃষ্টি এ সত্যকে মেনে নিতে ব্যর্থ হলো এবং এ মু’জিযাকে তারা ‘যাদু’ আখ্যা দিয়েই ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রইলো। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে বলেন–

وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ : আর তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। (সূরা বাকারা-৭)

সীরাত লেখকগণের বর্ণনা অনুযায়ী চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি নবুয়তের পঞ্চম বছর অর্থাৎ হাবাশার হিজরতের বছরই সংঘটিত হয়েছিলো। হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রহ. ও আল্লামা আলূসী রহ.-ও এমনটি উল্লেখ করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, দালায়িলুন নবুওয়াহ লি-আবী নুআইম; হা.নং ২০৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮৬৮, মুসনাদে আবূ দাঊদ তৃয়ালিসী; হা.নং ২৯৩, আল ফিতান লি-নু‘আইম ইবনে হাম্মাদ; হা.নং ১৬৭৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩৯২৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা ক্বমার-১, তাফসীরে রুহুল মা‘আনী; সূরা ক্বমার-১, ফাতহুল বারী ৭/১৮২-১৮৩, বাবু ইনশিকাকিল ক্বমার)

হযরত হামযা রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ

হাবাশায় প্রথম হিজরতের পর মুসলমানগণ দু’টি বিশেষ নেয়ামত লাভ করেন। আর তা হলো, মক্কার সেরা দুই সাহসী বীর নবীজীর চাচা হযরত হামযা ও হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ। এ দুজনের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম তার শেকড়ে আরো দৃঢ়তা লাভ করে। ফলে মুসলমানরা প্রকাশ্যে বাইতুল্লায় গিয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একবার আবূ জাহাল সুযোগ পেয়ে নবীজীকে অনেক নির্যাতন করলো এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিলো। প্রতিউত্তরে নবীজী তাকে কিছুই বললেন না। আল্লাহর দীনের খাতিরে বরদাশত করলেন। ইতোমধ্যে নবীজীর চাচা হযরত হামযা রাযি. তীর-ধনুক সঙ্গে নিয়ে শিকার হতে ফিরছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় কুরাইশদের মজলিসে আবূ জাহালের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ধনুক দ্বারা তার মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। এতে আবূ জাহাল মারাত্মকভাবে আহত হলো। হযরত হামযা রাযি. নবীজীর কষ্টদানকারীকে আঘাত করেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং তাৎক্ষণিক নবীজীর দীন গ্রহণ করারও প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিলেন! ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরকে এবং তার সাহস ও শক্তিকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিলেন। (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১/১১৩)

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ

আসহাবে ফীলের ঘটনার **১৩** বছর পর হযরত উমর রাযি. জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার দরুন তিনিই কুরাইশদের ‘দূত’-এর ভূমিকা পালন করতেন। ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি আবূ জাহালের মতই কঠোর ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। (উসদুল গাবাহ; হযরত উমর রাযি.-এর জীবনী)

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক রহ.-এর বর্ণনামতে, হাবাশায় প্রথম হিজরতের পরেই হযরত উমর ফারূক ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/১৮২; বাব: ইনশিকাকিল কমার)[১]

ইসলামের প্রতি হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর আগ্রহের সূচনা হয় এভাবে যে, একদিন তিনি হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে মসজিদে পৌঁছলেন। নবীজী তখন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

অর্থ : নিশ্চয় এ (কুরআন) এক সম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী। এটা কোনো কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমরা অল্পই ঈমান আন। আর না এটা কোনো অতীন্দ্রিয়বাদীর বাণী, (কিন্তু) তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ কর। এ বাণী অবতীর্ণ করা হচ্ছে জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর যদি সে (অর্থাৎ রাসূল কথার কথা) কোনো (মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করতো, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম! (সূরা হাক্কা–৪০-৪৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১০৭)

নবীজীর পবিত্র যবানে কুরআনের এ হৃদয়স্পর্শী তিলাওয়াত শুনে ইসলামের প্রতি হযরত উমরের কঠোরতা

---

১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল কাদীরে লিখেন,

تنبيه: جعل بن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة ولم يذكر انشقاق القمر فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام وقد ذكر بن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى.

কোমলতায় রূপান্তরিত হলো। পরবর্তীতে হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতেই হযরত উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবীজী দু'আ করেছিলেন–

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আবূ জাহাল ও উমর ইবনে খাত্তাবের মধ্য হতে যে তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করুন!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর কাছে হযরত উমর রাযি.-ই বেশি প্রিয় ছিলেন! অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবীজীর এ দু'আকে হযরত উমর রাযি.-এর জন্য কবুল করলেন। (তিরমিযী; হা.নং ৩৬৮১)

নবীজীর দু'আ কবুলের ঘটনাক্রম হিসেবে দীর্ঘ একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত উমর রাযি. তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে নবীজীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। পথিমধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী বোন ও ভগ্নিপতির ঘরে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তাদের ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘটনার বাস্তবতায় বোন ও ভগ্নিপতিকে বেদম প্রহার করেন। কিন্তু ঈমানের নূর তার বোন ও ভগ্নিপতির অন্তরকে এমনভাবে উদ্ভাসিত করেছিলো যে, সে আলোয় উমর রাযি.-এর অন্তরের তমসাও বিদূরিত হতে থাকলো। এরপর সূরা 'ত্ব-হা' শ্রবণ করত তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে সাফা পাহাড়ের উপরে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন!

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, উমরের ইসলাম গ্রহণ আমাদের জন্য বিজয় ছিল। তার হিজরত ছিলো আমাদের জন্য সহযোগিতা। তার নেতৃত্ব ছিলো আমাদের জন্য রহমত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত আমরা ঘরে (গোপনে) নামায পড়তাম। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, আমরা (প্রকাশ্যে বাইতুল্লায় গিয়ে) নামায আদায় করলাম। (উসদুল গাবাহ; হযরত উমর রাযি.-এর জীবনী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১১৪, ১১৫)

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

মক্কার কাফের কুরাইশদের অভ্যাস ছিলো, তারা যখন কাবার তাওয়াফ করতো, তখন তারা তাদের দেবতাদের নাম এভাবে স্মরণ করতো–

واللّات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى فانهنّ الغرانيق العلى وإن شفاعتهنّ لترتجى

অর্থ : লাত, উয্যা ও তৃতীয় মূর্তি মানাতের কসম! তারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান! এবং তাদের শাফায়াতের আশা করা যায়! (মু'জামুল বুলদান ৪/১১৮' উয্যা শব্দ দ্র.)

আল্লাহ তা'আলা যখন সূরা নাজম নাযিল করলেন, তখন তাতে কাফেরদের এ সকল দেবতার অসারতার কথাও উল্লেখ করলেন। পাশাপাশি এ সূরার শেষে একটি সাজদার আয়াতও নাযিল করলেন। হাবশার প্রথম হিজরতের পর নবুয়তের পঞ্চম বছরের শেষ দিকে রমযান মাসে একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে উপস্থিত হয়ে কাফের সরদারদের উপস্থিতিতে সূরা নাজম তিলাওয়াত শুরু করলেন। যখন তিনি সূরার মাঝে কাফেরদের দেবতাদের সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সূরার শেষে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সূরা শেষ করলেন, তখন উপস্থিত সকল মুসলমান সিজদার আয়াত হিসেবে সিজদা করলেন। আর কাফেররা তাদের দেবতার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মুসলমানদের সাথেই ভূমিতে মাথা লুটিয়ে দিলো।

ক্রমে এ সংবাদ হাবশায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের নিকট কিছুটা বিকৃত হয়ে এভাবে পৌঁছল যে, মক্কার কাফেররা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে.! এজন্যই তো তারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে সিজদা করেছে![1] (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০৭১, উমদাতুল কারী; হা.নং ১৭০১-বাবু সুজূদিল মুসলিমীন মাআল মুশরিকীন, ইনআমুল বারী; ৪/২৫০-বাবু মা-জা-আ ফী সুজূদিল কুরআন ও সুন্নাতিহা, সীরাতুন্নাবী ১/১৫৫, আর-রহীকুল মাখতূম ১০৯)

এ সংবাদ পেয়ে হাবাশায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কায় চলে আসার পর যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তারা কাফেরদের দ্বারা পূর্বের চেয়ে আরো বেশি নির্যাতিত হতে লাগলেন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় হাবাশা অভিমুখে হিজরতের নির্দেশ দান করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'হাবাশার দ্বিতীয় হিজরত' নামে প্রসিদ্ধ।

এ হিজরতে নবীজীর চাচাতো ভাই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব রাযি., বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.-সহ মোট ৮৩ জন পুরুষ সাহাবী ছিলেন। তন্মধ্যে অনেক সাহাবীর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও সঙ্গে ছিলো। হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. নিজ জন্মভূমি ইয়ামান থেকে সমুদ্রপথে মক্কায় আসার সময় সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে তাদের জাহাজ হাবাশায় গিয়ে পৌঁছায়। এভাবে তিনিও হযরত জাফর রাযি.-এর সাথে মিলিত হন। পরবর্তী সময়ে খাইবার বিজয়ের পর তিনি হযরত জাফর রাযি.-এর সাথে হাবাশা থেকে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৭১, ফাতহুল বারী ৭/১৮৮-বাবু হিজরতিল হাবাশা, সীরাতে মুস্তাফা ১/২৩৯)

---

১. কাফেরদের সিজদা করার নেপথ্যে একটি ভিত্তিহীন ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, সূরা নাজম তিলাওয়াত করতে গিয়ে শয়তান নবীজীর যবান নকল করে এ অংশটি পাঠ করে- تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهنّ لترجى এটা শুনে কাফেররা এ ভেবে দারুন খুশি হলো যে, মুহাম্মাদ মূর্তিপূজার ধর্মে ফিরে গেছে! এবং সাথে সাথে তারা সেজদা করলো...!!

এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শাইখ ইবনুল আরাবী, কাযী ইয়ায, আল্লামা আইনী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম এ ঘটনাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন।

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন-

وأما ما يزويه الإخباريون أن سببه ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على الأصنام بقوله تلك الغرانيق العلا فباطل لا يصح لا نقلاً ولا عقلاً لأن مدح إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان بلسانه حاشاه منه أقول وهذا هو الحق والصواب.

এখানে সহীহ ঘটনা ততটুকুই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১২৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা হজ্জ- ৫২নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য। আশ-শিফা লি কাযী ইয়ায ২/১১৬, সীরাতুন্নবী ১/১৫৫, আল কাওয়াকিবুদ দারারী শরহে কিরমানী ৬/১৫৩ باب من قرأ السجدة ولم يسجد, উমদাতুল কারী; সূরা হজ্জ ১৯/৬৬)

হাবাশায় মুসলমানদের অবস্থান

হাবাশায় মুসলমানগণ ন্যায়পরায়ন বাদশাহ আসহামার অধীনে শান্তিতে দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু স্বভাবতই মক্কার কাফেরদের জন্য তা অসহনীয় ছিলো। কাজেই তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রবী'আ ও আমর ইবনুল আসকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে দূত হিসেবে হাবাশার বাদশার কাছে প্রেরণ করলো। তারা গিয়ে বাদশার সকল আমলাদেরকে উপঢৌকনের নামে ঘুষ প্রদান করে বাদশার দরবারে তাদের নিবেদনে সমর্থনের আশ্বাস আদায় করে নিলো। অতঃপর তারা বাদশার দরবারে গিয়ে হাবাশায় অবস্থানরত মুসলমানদের নামে বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে মুসলমানদেরকে তাদের কাছে হস্তান্তরের আবেদন জানালো। পূর্বচুক্তি অনুযায়ী আমলারাও তাদেরকে সমর্থন দিলো। কিন্তু বিজ্ঞ বাদশাহ মুসলমানদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে তাদের নতুন দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মুসলমানদের মধ্য হতে হযরত জাফর রাযি. মুখপাত্রের ভূমিকায় এক জোরালো ভাষণে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরলেন। ইতিহাসের ইতিহাসে সে ভাষণটি আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি বলেছিলেন–

'হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। মূর্তির পূজা করতাম। মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করতাম। অশ্লীল কাজে আনন্দ পেতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করতাম। আমাদের সবলেরা দুর্বলদের শোষণ করতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে আমাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল পাঠালেন, যার বংশীয় আভিজাত্য, সততা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতায় আমরা আশ্বস্ত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে পাথর ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদ ও তারই ইবাদাতের দিকে আহ্বান করলেন। সত্য বলা, আমানতের সম্পদ প্রাপকের নিকট অর্পণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা প্রভৃতি বিষয়ের আদেশ দিলেন এবং নিকটাত্মীয়কে বিবাহ করা, রক্তপাত করা, অশ্লীলতা, মিথ্যা বলা, এতীমের সম্পদ খাওয়া, নিষ্কলুষ নারীকে চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া প্রভৃতি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। এর পাশাপাশি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে, তার সাথে কাউকে শরীক না করতে, নামায-রোযা ইত্যাদি আদায় করতে আদেশ করলেন।

ফলে আমরা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার আনীত বিষয়ের অনুসরণ করেছি। তিনি যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা হারাম জেনেছি। তিনি যা হালাল বলেছেন, তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ কারণে আমাদের স্বজাতি আমাদেরকে নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মূর্তিপূজার অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে আমাদের সাথে বৈরিতায় লিপ্ত হয়েছে..! যখন তারা আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে এবং আমাদের দীন-ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তখন আমরা পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড ছেড়ে আপনার ভূমিতেই আশ্রয় খুঁজেছি এবং আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করেছি! আর হে বাদশাহ! আমাদের বিশ্বাস, আমরা আপনার ন্যায়পরায়নতা থেকে বঞ্চিত হবো না!!'

হযরত জাফর রাযি.-এর হৃদয়স্পর্শী এ ভাষণ শুনে বাদশাহ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। এরপর যখন হযরত জাফর রাযি. বাদশাহকে সূরা মারইয়ামের কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন,তখন কুরআনের মর্মস্পর্শী তরঙ্গ সত্যান্বেষী বাদশাহর হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। বাদশাহ কাঁদতে কাঁদতে কাফের দূতদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم اليكم ابدا.

অর্থ : নিশ্চয় এ কালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে বাণী (তাওরাত) নিয়ে এসেছিলেন, তা এক-ই 'আলোর উৎস' থেকে প্রবাহিত। খোদার কসম! আমি কখনোই তাদেরকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করবো না; তোমরা চলে যাও!!

ফলে সেদিনকার মত কাফের প্রতিনিধিরা চলে গেল। বাদশাহ ছিলেন খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। জনসাধারণ্যে প্রচলিত খ্রিস্ট মতবাদ হিসেবে একথা প্রচলিত ছিলো যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীরা নিরাশ না হয়ে পরদিন পুনরায় বাদশাহর দরবারে গিয়ে অভিযোগ করলো যে, এ মুসলমানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিত কথা বলে থাকে!

গুরুতর অভিযোগে বাদশাহ আবার মুসলমানদেরকে আবার ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি মুসলমানদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন জাফর রাযি. জবাবে বললেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র নন; বরং তার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে 'কুন' কালিমার মাধ্যমে পিতা ছাড়াই হযরত মারইয়ামে গর্ভে জন্ম দান করেছেন!

সত্যান্বেষী বাদশাহও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে এমন আকীদাই পোষণ করতেন। ফলে তিনি তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন করলেন এবং কাফেরদের প্রদত্ত ঘুষ ফেরত দিয়ে দরবার থেকে বের করে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে বললেন– فأنتم سيوم بأرضي তোমরা আমার ভূমিতে নিরাপদ।

ফলে মুসলমানগণ নিরাপদেই হাবাশায় অবস্থান করতে লাগলেন। তবে অপরদিকে মক্কায় মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। এমনকি কাফেররা নবীজীর চাচা আবূ তালেবের প্রভাব বলয়ের বাইরে গিয়ে এমন সব হঠকারী ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনে লিপ্ত হলো যে, দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন সহচর ও গোত্রের লোকদেরসহ পাহাড়ের ঘাটিতে বন্দী করে রাখলো! দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের সে অবর্ণনীয় দৃষ্টান্ত আজও উম্মতের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণাদায়ক!!

(দ্বিতীয় হিজরতের পরবর্তী ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমাদে; হা.নং ১৭৪০–

قال شعيب الأرنووط : إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُحَمَّد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه)

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

গ্রন্থ পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব কৃত

ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

সহীহ আকীদা ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস মানুষের প্রথম, প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যারা সহীহ আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে আজীবন তা লালন করেছে যুগে যুগে তারাই কামিয়াব হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সহীহ আকীদা বর্জন করে ভ্রান্ত আকীদা ধারণ করেছে, তারা দুনিয়াতে ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে, আর আখিরাতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। এজন্য আকীদা-বিশ্বাস সহীহ করা ও সহীহ রাখার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। আকাইদের ঐক্য ও অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম-অমুসলিম, হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর পরিচয় নির্ণিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ আকীদা-বিশ্বাস এবং আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে এক থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম-অমুসলিম তো বটেই, স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায় চরম বিভক্তি। একপর্যায়ে সৃষ্টি হয় বহু ফেরকা ও নানা দল-উপদল। এই বহুবিধ দল-উপদলের পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ কেবল সরলপ্রাণ মুসলমানদের জন্যই নয়, অনেক জ্ঞানীগুণীর জন্যও সঠিক পথ অনুধাবনে ব্যাঘাত-বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উম্মতের মাঝে এই বিভ্রান্তি ও বিভক্তির ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানেও উম্মত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগেই উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, (অর্থ:) 'বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ১টি দল ছাড়া বাকী সকল দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ১টি দলের পরিচয় কী? তিনি বললেন, ما أنا عليه وأصحابي যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত-পথের অনুসারী।' অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের উপর থাকবে, কেবল তারাই কামিয়াব হবে।

হাজারো ফেতনা-ফাসাদ ও শতধাবিভক্তির মাঝেও উম্মত যেন সহীহ আকীদা-বিশ্বাস ধারণ করে তার উপর অটল-অবিচল থাকতে পারে, এজন্য উম্মতের দরদী রাহবার উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে যেমন বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে উম্মতকে সতর্ক করেছেন, তেমনি লেখা-লেখি ও কিতাবাদি রচনার মাধ্যমেও খুব জোরালোভাবে দলীল-প্রমাণসহ সহীহ আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন এবং ভ্রান্ত আকীদা থেকে উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে শতশত মূল্যবান গ্রন্থ। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন– ইমাম কাসেম ইবনে সাল্লাম (২২৪হি.), ইবনে আবী শাইবা (২৩৫হি.), আবূ আব্দুল্লাহ আল-আদনী (২৪৩হি.), ইমাম তৃহাবী (৩২১হি.), আবূ মনসূর আল-মাতুরিদী (৩৩৩হি.), ইবনে মানদাহ (৩৯৫হি.), আবূ বকর আল-বাইহাকী (৪৫৮হি.), ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) প্রমুখ ইমামগণ।

উর্দু ভাষায়ও এ বিষয়ে রচিত হয়েছে বহু মূল্যবান গ্রন্থ; তন্মধ্যে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর তালিমুদ্দীন, ফুরূউল ঈমান, শাহ শহীদ ঈসমাইল রহ.-এর তাকবিয়াতুল ঈমান, মনযুর নোমানী রহ.-এর দীন ও শরীয়ত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর দস্তুরে হায়াত অন্যতম।

তবে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা একেবারেই কম। তন্মধ্যে অন্যতম, প্রামাণ্য ও সমৃদ্ধ গ্রন্থ হলো– **ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ**। গ্রন্থটি লিখেছেন, দেশের বিশিষ্ট আলেমে দীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, জামি'আ মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা-এর সুযোগ্য মুহাদ্দিস, তাঁতীবাজার মাদরাসার সাবেক শাইখুল হাদীস, হযরতুল আল্লাম মাওলানা মাহমুদুল হাসান দা.বা.-এর সুযোগ্য খলীফা– মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব দা. বা.।

গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস

সর্বমোট ৭১৮ পৃষ্ঠার বিরাট কলেবরের এই মূল্যবান গ্রন্থটি এক ভলিয়মে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম খণ্ডে আকাইদ ও ইলমে কালাম সম্পর্কে এবং ২য় খণ্ডে বাতিল ফিরকা তথা ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে আলোচনা-পর্যলোচনা করা হয়েছে।

লেখক দা.বা. ১ম খণ্ডটিকে দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথম অধ্যায় : ইলমে কালাম বিষয়ক। এখানে তিনি ইলমে কালাম কী ও কেন? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, এর সূচনা, ইতিহাস ও অবদান ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঈমান ও আকাইদ বিষয়ক। এখানে ঈমান ও আকাইদ সংক্রান্ত কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা, আকাইদের প্রকার ও স্তরগত পার্থক্য, অনুরূপভাবে যেসব বিষয়ে ঈমান আনা জরুরী যেমন– আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আখেরাত, তাকদীর, মেরাজ, আরশ-কুরসি, সাহাবায়ে কেরাম, কিয়ামতের আলামত, ইমাম মাহদী, মিথ্যা মাহদী, দাজ্জাল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি প্রায় ৯০টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আর ২য় খণ্ডটিকে আটটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন।

প্রথম অধ্যায় : হক ও বাতিল সংক্রান্ত কিছু বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ'তেকাদী ফিরকা তথা বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভেদকারী দল-উপদল বিষয়ক আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় : দেশীয় বাতিল ফিরকাসমূহ।

চতুর্থ অধ্যায় : আধ্যাত্মিক ও বিদআত সংক্রান্ত বিষয়ক।

পঞ্চম অধ্যায় : রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অর্থনৈতিক মতবাদ বিষয়ক।

সপ্তম অধ্যায় : দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিষয়ক।

অষ্টম অধ্যায় : ভ্রান্ত ধর্ম এবং এ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ।

বর্ণনাভঙ্গি

১. গ্রন্থটির বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। ফলে পাঠকের মেধা ভাষা-সাহিত্যের পেছনে পড়ে মূল তথ্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

২. মাদরাসার ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেরই উপযোগী করে তোলার স্বার্থে ক্লাসিক্যাল বর্ণনার ধাঁচও কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে। এজন্য আলোচনাকে আবেগমুক্ত ও বর্ণনামূলক রাখা হয়েছে।

৩. গ্রন্থের কলেবর যাতে খুব বেশী বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ১ম খণ্ডে বর্ণিত কোনো আকীদার বিষয়ে কোনো বাতিল ফিরকার ভিন্নমত থাকলেও প্রায়শই তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ২য় খণ্ডে সংশ্লিষ্ট বাতিল ফিরকার আলোচনা প্রসঙ্গে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে ১ম খণ্ডে মূল পাঠে বা টীকায় সেদিকে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মতবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোকে এতো সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সর্বস্তরের পাঠক তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। এছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

১. ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ।

২. আকাইদ শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে শুরুতে ইলমে কালাম সম্বন্ধে আলোচনা।

৩. ইলমে কালাম ও আকাইদ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা।

৪. পরবর্তী যুগে সৃষ্ট যেসব মতবাদের আকীদা সম্বন্ধে আকীদার প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে বিবরণ পাওয়া যায় না, সে সব মতবাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিবরণ।

৫. দেশী-বিদেশী ও নতুন-পুরাতন সব ধরনের বিশেষ বিশেষ বাতিল ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে তার খণ্ডন।

৬. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সব ধরনের বাতিল মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা।

৭. দেশীয় বিভিন্ন ভণ্ড পীরের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা ও তার খণ্ডন।

৮. ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও তার ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা।

৯. যথাসম্ভব প্রত্যেক ফিরকার নিজস্ব উৎস থেকে তাদের বক্তব্যসমূহের উদ্ধৃতি।

১০. প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহের গ্রন্থের লেখক, পৃষ্ঠা নং ও সংস্করণ-এর উল্লেখ।

এছাড়াও গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর পাণ্ডুলিপি দেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিসকে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক বহু স্থানে পরিবর্তন - পরিবর্ধন করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি যাচাইকারী বিশিষ্ট আলেমগণ হলেন– হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ., হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব দা.বা., হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী সাহেব দা.বা. ও হযরত মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ সাহেব দা.বা.।

গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে এসব গুণী উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিমতগুলো গ্রন্থের শুরুতেই যুক্ত করা হয়েছে।

কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ. বলেন, 'আমি ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ নামক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়েছি। লেখকের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। এরূপ দুরূহ বিষয়কে সুন্দর বাংলায় ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বের জন্য লেখককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি (দ্বিতীয় খণ্ড) কওমী মাদরাসার ফযীলত বা তাখাসসুস পর্যায়ে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থখানি পাঠ করার দ্বারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, উলামা ও তলাবা সর্বশ্রেণীর পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন বলে মনে করি।'

সাবেক বেফাক মহাসচিব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার রহ. বলেন- 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর নেছাবভুক্ত আকাইদের কিতাব-শরহে আকাইদে নাসাফী-এর সঙ্গে বর্তমান যুগের ফেরাকে বাতেলার একটা অধ্যায় যোগ করার নিমিত্তে সহায়ক একখানি পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনেকদিন পূর্বে। ১২/০৬/৯৫ ঈসায়ী তারিখ। কিন্তু লেখকের অভাবে সিদ্ধান্তটি দীর্ঘদিন যাবৎ কার্যকর করা যাচ্ছিল না। অবশেষে নবীন ও গবেষক লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ০৮/০৬/২০০০ ঈসায়ী তারিখে তার সঙ্গে উক্ত পুস্তক লেখার একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। ...আমার ধারণামতে গ্রন্থখানি ফেরাকে বাতেলা সংক্রান্ত এক বিরাট ভাণ্ডার হিসেবে সমাজের নিকট, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হবে।'

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব দা.বা. বলেন, 'আমি ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। এ গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক সহীহ আকীদার বিবরণ প্রদান এবং এসব আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন ফেরকা ও মতবাদ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সুসংরক্ষণ ও সুসম্প্রসারণের দায়িত্ব পালনের অব্যাহত ধারায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় যথেষ্ট কিতাবাদি রয়েছে। এমনকি খণ্ড খণ্ডভাবে বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। তবে আমার জানামতে এ গ্রন্থখানি এ বিষয়ে অন্যতম হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।'

প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ আলেমে দীন হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী সাহেব দা.বা. বলেন, 'আমি ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। লেখক দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যুগচাহিদার আলোকে ইসলামের সহীহ আকায়েদ এবং আকায়েদ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক শাস্ত্র; ইলমে কালাম সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। আলোচনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাত সহকারে অত্যন্ত তথ্যভিত্তিক হয়েছে। সচরাচর যা দৃষ্টিতে পড়ে না।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থটির পরিচয় এবং বিষয়, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের সামান্য এই ইশারা-ইঙ্গিত বা ধারণায় আশা করি অনুমিত হচ্ছে যে, গ্রন্থটি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের জন্য কতোটা উপকারী ও জরুরী। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মুসলমানদের ঘরে ঘরে গ্রন্থটি থাকা আবশ্যক।

আলহামদুলিল্লাহ! এ পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই প্রতিবার ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ব্যাপক চাহিদার কারণে এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে চতুর্থ সংস্করণও শেষের পথে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গ্রন্থটি বার বার পাঠ করে ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ করে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বে কারীম।

লেখক: শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, যশোর।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

ইমরান মাহমূদ
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা

৩৫৬ প্রশ্ন : (ক) যোহর, মাগরিব, ইশার ফরয নামাযের কতক্ষণ পর সুন্নাত নামায পড়তে হবে? কতক্ষণ পর সুন্নাত নামায পড়লে অসুবিধা হবে না? যদি প্রতিদিন দেরিতে সুন্নাত নামায পড়ে তাহলে কী হুকুম?

(খ) জুমু'আর দিন কখন মসজিদে যেতে হবে? কতক্ষণ আগে না গেলে গুনাহ হবে?

(গ) নামায আদায়কারী ব্যক্তি দুর্বলতার কারণে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির উপর ভর করে সিজদা থেকে দাঁড়াতে পারবে কিনা?

উত্তর : (ক) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত দু'আ, যিকির-আযকার করা যেতে পারে। তবে যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত আছে সে সকল নামাযের পর সুন্নাতের আগে সংক্ষিপ্ত দু'আ-ইস্তেগফার করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

عن ثوبان قال كان رسول الله ﷺ اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قال الوليد فقلت للاوزاعي كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله استغفر الله مسلم برقم ٥٩١

عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي ﷺ اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام وفي روايه ابن نوير يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم برقم ٥٩٢

এই দুই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. ই'লাউস সুনানে উল্লেখ করেছেন, যে সকল হাদীসে নামাযের পর দীর্ঘ দু'আ-দুরূদ পড়ার কথা বর্ণিত আছে, সে সকল হাদীস সেসব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব নামাযের পর সুন্নাত নেই। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত দু'আ-দুরূদের হাদীস প্রযোজ্য হবে ঐ সকল ফরয নামাযের পর যেগুলোর পরে সুন্নাত আছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন ফাতাওয়া শামীতে উল্লেখ করেছেন যে, ফরয নামাযের পর সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুরূদ পড়া যেতে পারে। তবে দীর্ঘ দু'আ-দুরূদ পড়া মাকরূহে তানযীহী। ইমাম আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবনে সাউদ আল কাসানী 'বাদায়িউস সানায়ে'তে, শাইখ যাইনুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম 'আল-বাহরুর রায়িক'-এ, আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাঈল আত্-তাহ্তাবী 'হাশিয়াতুত্ তাহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ'-এ অনুরূপ উক্তি উল্লেখ করেছেন।

এ সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহদের উক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে, ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত দু'আ-দুরূদ করা যেতে পারে। দীর্ঘ দু'আ-দুরূদ সুন্নাতের পরে পড়া ভালো।

সুতরাং যোহর, মাগরিব, ইশার ফরয নামাযের পর খুব সংক্ষিপ্ত দু'আ-যিকির করে সুন্নাত পড়বে এবং দীর্ঘ দু'আ, যিকির-আযকার সুন্নাতের পর পড়বে।

দৈনিক দেরিতে সুন্নাত নামায পড়লে সুন্নাত আদায় হবে ঠিকই; কিন্তু এটা খিলাফে সুন্নাত ও অনুত্তম। এতে সওয়াব কমে যায়। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ফরয পড়ে বেশি দেরি না করে সুন্নাত পড়ে নাও। কারণ সুন্নাত নামাযকে ফরয নামাযের সাথে আসমানে তুলে নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ফরয নামাযের পরে কোন প্রকার দু'আ-দুরূদ না পড়ে সাথে সাথে সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাহ পরিপন্থী। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৪৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৯২, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৯৮৪৮, সুনানে বাইহাকী; হা.নং ২৮০৪, ফাতাওয়া শামী ১/৫৩০, ২/১৯, বাদায়িউস সানায়ে ১/৬৭৯, ৬৮০, আল-বাহরুর রায়িক ২/৫৮ ই'লাউস সুনান ৩/১৮৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩০)

(খ) জুমু'আর দিন ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব। জুমু'আর দিন তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমু'আর দিন যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মসজিদের দরজায় ফেরেশতাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কুরবানী করে। তারপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায়। এরপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। তারপর ইমাম যখন মিম্বরে বসেন, তখন ফেরেশতাগণ তাদের দপ্তর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগসহ খুতবা শুনতে থাকেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯২৯)

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে গোসল করবে, ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আযানের অপেক্ষা না করে মসজিদের দিকে রওনা হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে, ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসবে, উভয় খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং খুতবার সময় কোন কাজ বা কথায় লিপ্ত না হবে, তাহলে তার যাওয়ার পথে প্রত্যেক কদমে এক বছর নফল রোযা রাখার ও এক বছর নফল নামায পড়ার সওয়াব দেয়া হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৫)

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বোঝা যায় জুমু'আর দিন ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে গমন করা মুস্তাহাব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় জুমু'আর নামাযে আযান শুধু একটি ছিল; যা খতীব সাহেবের সামনে খুতবার পূর্বে দেয়া হতো। কিন্তু হযরত উসমান রাযি.-এর যামানায় মদীনা শহর বড় হয়ে যাওয়ায় এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জামাআতের লোকসংখ্যা অধিক হতে শুরু করলো। তখন হযরত উসমান রাযি. সাহাবীদের পরামর্শে মসজিদের বাইরে জুমু'আর আরেকটি আযান বৃদ্ধি করেন। ফলে ইজমায়ে সাহাবায়ে কেরামের শরয়ী দলীল দ্বারা জুমু'আর প্রথম আযান সাবিত হয়।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ প্রথম আযানের সময় সাঈ অর্থাৎ মসজিদের দিকে রওনা করা জরুরী। প্রথম আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় করা, এমনকি ঘরে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা,

যিকির-আযকার করা, নফল নামায পড়া বা অন্য কোন ইবাদত করা জায়েয নেই। আযানের পরপরই মসজিদের দিকে রওনা করা অপরিহার্য। তবে কেউ যদি খুব ব্যস্ততার কারণে জুমু'আর প্রথম আযানের পূর্বে গোসল করতে না পারে বা খুব ক্ষুধা লাগে, তাহলে তাড়াতাড়ি গোসল করে বা খানা খেয়ে মসজিদে যাবে। তবে শর্ত হলো, এতে যেন জুমু'আর পূর্বের সুন্নাত ও খুতবা ছুটে না যায়। আর যদি সুন্নাত অথবা খুতবা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে শুধু উযূ করে মসজিদে যাবে। প্রথম আযানের পর জামাআতের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য যেকোনো কাজে লিপ্ত হওয়া গুনাহের কাজ। (সূরা জুমু'আ- ৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৯০৪, ৯১২, ৯২৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৫, ফাতাওয়া শামী ২/১৬১, আল-ফিকহুল ইসলামী ২/১২৮১, বযলুল মাজহুদ ফী হাল্লি সুনানি আবী দাউদ ২/৫৫৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১১৪, ১১৬)

(গ) কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে এত দুর্বল হয়ে যায় যে, সে কোন কিছুতে ভর করা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না বা জমিনে ভর করে দাঁড়াতে পারে না, তাহলে এই সূরতে ঐ অসুস্থ ব্যক্তি চেয়ার-টেবিল বা অন্য কিছুর উপর এক হাতে ভর করে দাঁড়াতে পারবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৯৯২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৮৮, বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৬, ফাতাওয়া কাসেমিয়া ৫/৭৩৭)

তামজীদ ইসলাম
খিলগাঁও, ঢাকা

৩৫৭ প্রশ্ন : সা'দপন্থী ইমামের পিছনে কি নামায আদায় করা যাবে? এ ব্যাপারে প্রমাণাদিসহ উত্তর পেলে আমাদের মসজিদের ইমামকে বদলি করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

উত্তর : মাওলানা সা'দ সাহেব কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও ফাতাওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পন্থা থেকে হটে গিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে চরম গোমরাহীর শিকার হয়েছেন। নিজের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে তাবলীগ জামাআতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করেছেন। পরস্পরের মাঝে মতানৈক্য ও কোন্দল তৈরি করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়ায় বলা হয়েছে, মাওলানা সা'দ সাহেব একটি গোমরাহ দল তৈরিতে লিপ্ত রয়েছেন। তার অনুসারীরা সেই গোমরাহ দলেরই সদস্য। তারা হক্কানী সকল আলেমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং গালাগাল করে। সেই বিদ্বেষের ফলে তার কিছু অনুসারী নিরীহ-নিরস্ত্র আলেম-উলামা ও তালিবে ইলমদের নৃশংসভাবে মারপিট করে রক্তাক্ত করেছে, যা নিঃসন্দেহে মারাত্মক কবীরা গুনাহ এবং জঘন্যতম অন্যায়। আর অবশিষ্ট অনুসারীরা অন্যায় কাজকে মনেপ্রাণে সমর্থন করে ও এর জন্য আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে। আর গুনাহের সমর্থন করাও যেহেতু গুনাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে সমর্থন বা অনুসরণ করবে সে নাজায়েয কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে চরম পর্যায়ের ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর ফাসিকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

অতএব সামর্থ্য থাকলে সা'দপন্থী ইমামকে দ্রুত অব্যাহতি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার পেছনে নামায না পড়ে একজন সৎ, যোগ্য, মুত্তাকী, হকপন্থী আলেমের পিছনে নামায পড়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা আপনাদের উপর একান্ত কর্তব্য। (সূরা মায়িদা- ২, সূরা কাসাস- ১৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ১০০, ৬০৪৩, ৬০৪৪, ৬৫০২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬৪, ২৬৭৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৩৪৫, তাফসীরে কুরতুবী ৪/২৯৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৭, ফতাওয়া শামী ১/৫৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১৭১, ১৭৮)

সভাপতি ও ইমাম
প্যারাডাইস আল-মদিনা
উত্তর বাসাবো, ঢাকা

৩৫৮ প্রশ্ন : আমি প্যারাডাইস আল-মদিনা ৫৬/৭/৫ উত্তর বাসাবো, ঢাকা-১২১৪ আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে মোট ১৩০টি ফ্লাট আছে। উক্ত ভবনের নিচ তলায় ২৮০-৩০০ জন মুসল্লী ধারণক্ষমতার একটি মসজিদ আছে। উক্ত মসজিদে বিগত জুন ২০১৬ থেকে ইমাম এবং মুআযযিন সাহেব নিয়োজিত আছেন। আবাসিক ভবনের বাসিন্দাগণ নিয়মিত পাঞ্জেগানা নামায আদায় করে আসছেন। বর্তমানে অ্যাপার্টমেন্ট কমিটি ও মুসল্লীগণের ইচ্ছা যে, এখানে জুমু'আর নামায চালু হোক।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে, আমাদের জন্য উক্ত ভবনে পরিপূর্ণ সিকিউরিটি বজায় রেখে বহিরাগত মুসল্লীদের প্রবেশাধিকার না দিয়ে শুধুমাত্র উক্ত ভবনের বাসিন্দাদের জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হবে কি? মুফতী সাহেবের কাছে এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত সূরতে আপনাদের প্যারাডাইস আল-মদিনা পাঞ্জেগানা মসজিদে প্রয়োজনে নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি বজায় রেখে শুধুমাত্র উক্ত ভবনের বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট সকল মুসলমানের অংশগ্রহণের সাধারণ অনুমতি প্রদানের শর্তে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয আছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন সমস্যা নেই। জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ব্যাপক অনুমতির যে শর্ত রয়েছে তা এক্ষেত্রে উক্ত ভবনের সকলের অনুমতি হলেই পূর্ণ হবে। বহিরাগতদের জন্যও উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক নয়। (ফাতাওয়া শামী ২/১৫২, মাজমাউল আনহুর ১/২৪৬, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫১০-৫১১, ফিকহী মাকালাত ৪/৩৮)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৫৯ প্রশ্ন : জনৈক মহিলা কয়েক বছর পূর্বে মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু মাঝে মধ্যে অনিচ্ছায় তার মুখ দিয়ে 'আল্লাহ নেই' এ জাতীয় শব্দ বের হয়ে যায় এবং একথা বলার পর সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।

এখন জানার বিষয় হলো, (১) তার ঈমানের কোন ক্ষতি হয়েছে কি না? হলে করণীয় কি? (২) তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোন অসুবিধা হয়েছে কি না? হলে করণীয় কি?

উত্তর : কেউ অনিচ্ছায় কুফুরী কথা বলে ফেললে তার ঈমান নষ্ট হয় না এবং বিবাহিত হলে বৈবাহিক সম্পর্কও নষ্ট হয় না।

প্রশ্নের বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত মহিলা এখনো পরিপূর্ণ সুস্থ হয়নি। সুতরাং যদি বাস্তবেই সে রোগের কারণেই তার মুখ থেকে এ জাতীয় শব্দ বের হয়ে যায়, তাহলে তাতে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্কও নষ্ট হবে না।

তবে তিনি এ জাতীয় কথা বলে ফেললে সাথে সাথে যেন তওবা করে নেন অভিভাবকগণ সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং তার সামনে বেশি বেশি আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ঘটনাবলী আলোচনা করবেন। আর যত দ্রুত সম্ভব তার জন্য ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/১৯৮, আল-বাহরুর রায়িক ৫/১২৯, ১৩৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১/৪৭০, ৪৭১)

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
পান্থপথ, ঢাকা

৩৬০ প্রশ্ন : (১) আমাদের অফিসের নির্ধারিত নামাযের জায়গায় আমরা জামাআতের সাথে নামায আদায় করে থাকি। ইদানিং এখানে ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলে। এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে ইকামত সহীহ হবে কি না? এবং নামাযে কোন সমস্যা হবে কি না?

(২) সৌদিআরবসহ বিভিন্ন দেশে একবার করে ইকামত দেয়া হয়ে থাকে এর কারণ কী?

উত্তর : ইকামতের মধ্যে أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. এই বাক্যগুলো দুইবার বা একবার করে বলা প্রসঙ্গে চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ., আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এবং কূফাবাসী উলামায়ে কেরামের মতে উল্লিখিত বাক্যগুলো দুইবার করে বলতে হবে এবং এটাই ইকামতের সুন্নাত তরীকা। যা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অপর মতটিও হাদীস দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু শাস্ত্রীয় নীতির আলোকে সে হাদীস অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও অন্য মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তার অনুসরণ সহীহ হবে। তাতে ইকামতের সুন্নাতও আদায় হবে।

সৌদিআরবসহ বিভিন্ন দেশে যে এক একবার করে ইকামতের তাকবীরগুলো বলে তা মূলত মাযহাবের ভিন্নতার কারণে; এতে কোন সমস্যা নেই। প্রত্যেকে তার নিজস্ব মাযহাবের ইমামের অনুসরণ করেই আমল করবে। অন্যথায় দীনের বিষয়টা প্রবৃত্তি পূজার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এতে সে দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।

উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে যারা ইজতিহাদী মাসাইলে হানাফী মাসাইলের বিপরীত আমল করে, এরা মূলত মাযহাব বিরোধী লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের লোক। আর লা-মাযহাবীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত বহির্ভূত– গোমরাহ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ অমুজতাহিদ লোকের জন্য ইজতিহাদী মাসাইলে মুজতাহিদের অনুসরণ কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। আর সকল ইজতিহাদী মাসআলায় নির্দিষ্ট মুজতাহিদের অনুসরণ উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে আবশ্যক ও নিরাপদ। কাজেই নীতিগত কারণে এদের আমল সুন্নাহসম্মত নয়। যদিও উক্ত পদ্ধতিতে ইকামত বললে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যেখানে দু'বার বলার নিয়মটিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি ও ফিতনাবাজী। বর্তমানে লা-মাযহাবীরা এ বিভ্রান্তি ও ফিতনাবাজীর উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে। সকলের উচিত এ জাতীয় ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২১৩১, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ১৭৮৯, ১৭৯০, ১৭৯১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৪, ফাতাওয়া কুবরা লি-ইবনে তাইমিয়া ৩/২০৪, ৫/৯৫, সুনানে দারেমী; হা.নং ৩১২, হাশিয়াতুত তাহতাবী ৪/১৫৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১০১)

মুহাম্মাদ জুনাইদ আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৬১ প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদে দুই চিল্লাওয়ালা একজন এতায়াতী ভাই আছে। সে মসজিদের মিম্বরে বসে গাশতের বয়ান, তা'লীম ইত্যাদি করে থাকে। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে একাজ করতে নিষেধ করাতে ইমাম সাহেবের সাথে তার ঝগড়া হয়। এমনকি সেটা মারামারির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন হলো, ইমাম ছাড়া ঐ এতায়াতী কিংবা অন্য কারো জন্য মসজিদের মিম্বরে বসে বয়ান বা তা'লীম ইত্যাদির অনুমতি আছে কি না? দলীল-প্রমাণসহ জানালে ভালো হয়।

উত্তর : মসজিদের মিম্বরে বসার হকদার নায়েবে নবী হিসেবে শুধুমাত্র ইমাম সাহেব। চাই খুতবা প্রদান করার জন্য বসুক বা ওয়াজ-নসীহত করার জন্য। ইমাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য মিম্বরে বসে বয়ান কিংবা তা'লীম করার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের অনুমতি আবশ্যক। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত এতায়াতী ভাইয়ের জন্য একেতো ইমাম সাহেবের অনুমতি ছাড়া মিম্বরে বসে গাশতের বয়ান বা তা'লীম করাটাই উচিত হয়নি। তার উপর আবার ইমাম সাহেবের নিষেধাজ্ঞাও ছিল। উপরন্তু সে একজন গোমরাহ লোক। তাই কোনভাবেই তার এ কাজটি ঠিক হয়নি। বর্তমানে উক্ত এতায়াতী ভাইয়ের জন্য জরুরী হলো, ইমাম সাহেবের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। সাথে সাথে এতায়াতীদের দল ত্যাগ করে তওবা করে হকপন্থী তাবলীগ জামাআতের সাথে জুড়ে দাওয়াতের কাজ করা জরুরী। (মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ৩০০, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬১৭৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮২, ফাতাওয়া শামী ৪/৭১, ৬/৪২১)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৬২ প্রশ্ন : জিন-শয়তান এবং সকল ধরনের বালা-মসীবত থেকে হিফাযতের উদ্দেশ্যে হায়েযা মহিলার জন্য কুরআনের আয়াত সম্বলিত ৭ মানযিল পড়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে তো হায়েয বা জানাবাত (গোসল ফরয থাকা) অবস্থায় কুরআন পাঠ করা জায়েয নেই। তবে কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে তথা আল্লাহর প্রশংসা বা শোকর আদায়ের লক্ষ্যে অথবা দু'আর উদ্দেশ্যে হলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কুরআনের ঐসব আয়াত পাঠ করা বৈধ হবে, যাতে ঐ উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ হয়। আর যে সমস্ত আয়াত দু'আ, প্রশংসা বা শুকরিয়া জ্ঞাপক কিংবা ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী হিসেবে প্রমাণিত নয়, সেগুলো ঐ অবস্থায় তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ৭ মানযিল জুনূবী এবং হায়েযা মহিলাদের জন্য পড়া জায়েয আছে। কেননা মানযিলের কতক আয়াত দু'আ সম্বলিত, কতক আয়াত আল্লাহর প্রশংসা বা শুকরিয়া জ্ঞাপক আর কতক আয়াতের দ্বারা দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার কথা প্রমাণিত আছে। অবশ্য এগুলো পড়ার পূর্বে উযূ করে নেয়া ভালো। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং , আল-মুহীতুল বুরহানী ১/২৪৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ১০৪, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৪৩, আন-নাহরুল ফায়িক ১/১৩২-১৩৩, আল-বাহরুর রায়িক ১/২০৯, ফাতাওয়া শামী

১/২৯১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৮০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/১০৬, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৯০, কিতাবুল ফাতাওয়া ২/১১১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৪৭, কিতাবুল মাসাইল ১/২২২-২২৩)

ডা. মুরাদ
শাহবাগ, ঢাকা

৩৬৩ প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু আছে– সা'দপন্থী। সে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। সে এবার হজে গিয়েছে। হজে যাওয়ার আগে আমি তার সাথে দেখা করতে গেলে সে কিছু কথা বলে। যা নিম্নরূপ-

১. ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ সালে যেটা হয়েছে সেটা সা'দপন্থীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তারা আমাদের কারণে কোন জায়গায় ইজতিমা করতে পারেনি।

২. হামলার উদ্দেশ্যে তারা মাঠে ঢুকেনি। হামলার জন্য হলে আরো মানুষ মারা যেত ও আহত হতো। তারা মাঠ আয়ত্বে নেয়ার জন্য ঢুকেছে।

৩. আলেমরা মিথ্যাচার করছে, আলেমদের ৮০% কথা মিথ্যা।

এমতাবস্থায় তার সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা যাবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আপনার বন্ধু যে বলেছে তারা হামলার উদ্দেশ্যে মাঠে প্রবেশ করেনি। বরং তারা মাঠ আয়ত্বে নেয়ার জন্য প্রবেশ করেছে। তার একথা ডাহা মিথ্যা। কারণ ঐ দিন ওরা লাঠি-সোটা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেছে। অনেকের বাহুতে সবুজ ফিতা বাঁধা ছিলো। অতঃপর যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই পিটিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে। মাল-সামানার গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শত শত মটর সাইকেল, প্রাইভেট কার, সাথীদের মাল-সামানা, কুরআন, কিতাব জ্বালিয়েছে। প্লেট, বাটি ইত্যাদি ভেঙে তছনছ করে ফেলেছে। আর যা তাদের ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়েছে সেগুলোর ভালো অংশও গনীমতের মাল ফাতওয়া দিয়ে আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

দীনের লেবাসধারী কোন মানুষ এতোটা নীচে নামতে পারে, এতোটা নৃশংস ও হিংস্র হতে পারে, সেটা না দেখলে কল্পনাও করা যেত না।

তাদের আক্রমণের তীব্রতা এতই ছিলো যে, যারা ঘুমিয়ে ছিলো, যারা নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলো, মোটকথা যাদের যে অবস্থায় পেয়েছিলো তাদের সেখানেই পিটিয়ে আহত করেছে। বয়ঃবৃদ্ধ পুরনো তাবলীগী সাথীরা কাকুতি-মিনতি করেও দুর্বল শরীরটিকে রক্ষা করতে পারেনি। খুঁজে খুঁজে আলমেদেরকে বিশেষ টার্গেট করে ওরা হামলা করেছে। কোন একজন আলেমকে পেয়েছে তো এমন উল্লাস করে পিটিয়েছে, মনে হয়েছে শত্রুপক্ষের কোন কাফের সেনাপতিকে বাগে পেয়েছে। নাবালেগ তালিবে ইলমরাও তাদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। ময়দানের ভিতর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় ঢুকে কুরআন পড়া অবস্থায় নিষ্পাপ শিশুদের মাথায় তুলে তুলে আছাড় দিয়েছে। ফুটবলের মতো লাথি মেরে নিজেদের ক্ষোভ মিটিয়েছে। যারা বাথরুমে লুকিয়ে ছিলো তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে পালাক্রমে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে।

ঐ ব্যক্তি যে বলেছে আলেমরা মিথ্যাচার করেছে, আলেমদের ৮০% কথা মিথ্যা। তার একথাও ঠিক নয়। এটা আলেমদের উপর অপবাদ। এ অপবাদের উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের শতভাগ মিথ্যাকে ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র।

আলেমরা হলো দীন রক্ষার বাহিনী, নবীগণের ওয়ারিস। আলেমদের দায়িত্ব হলো, দীনের ভিতর যেখানেই কোন সমস্যা দেখবে সেখানেই তারা তার সমাধান দিবে। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাওলানা সা'দ সাহেব দীনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আলেমরা তার সে মনগড়া ব্যাখ্যা, বয়ান, সমস্যগুলো মানুষের কাছে খুলে খুলে বোঝাচ্ছেন এবং তাদের ঈমান-আমলের হিফাযত করছেন। তাহলে এটা কীভাবে মিথ্যা হতে পারে? যেখানে দেওবন্দসহ সমস্ত হক্কানী আলেম-উলামা একমত যে, সা'দ সাহেব গোমরাহ দল তৈরিতে লিপ্ত। তাহলে আলেমদের ৮০% কথা কীভাবে মিথ্যা হতে পারে?

এমতাবস্থায় আপনার করণীয়

আপনার বন্ধুকে প্রথমে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রভাবে বোঝাবেন যে, মাওলানা সা'দ সাহেব ভুলের উপর আছেন। এ ধরনের লোকের অনুসরণ জায়েয নেই। আর উলামায়ে কেরাম হকের উপর আছেন। তারা মিথ্যা কথা বলছেন না। বরং তারা বাধ্য হয়ে তার সমস্যাগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। সাথে সাথে আপনার বন্ধুর হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন।

আপনার বন্ধু যদি তওবা করে ফিরে আসেন তাহলে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন। এক্ষেত্রে আপনার বন্ধুর জন্য সতর্কতামূলক পুনরায় বিবাহ নবায়ন করে নেয়া উত্তম।

আর যদি তিনি তওবা করে ফিরে না আসেন তাহলে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা যাবে না। দেখা হলে শুধু সালাম করেই ক্ষান্ত থাকবেন। (সূরা ফাতির- ২৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৪১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৬, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২০৭, মাজমাউল আনহুর ২/৫০৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/২৪৩)

মুহাম্মাদ মা'সূম
কেরানীগঞ্জ

৩৬৪ প্রশ্ন : আমার দোকানের জমির মালিকের সাথে ২ লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স এবং প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ চুক্তি হয়েছে। এখন আমি সেই দোকান অন্যজনের কাছে ৬ হাজার টাকা ভাড়া চুক্তি করেছি। এভাবে চুক্তি করা আমার জন্য বৈধ হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে তাহলে বৈধ কোন সূরত বলে দিলে ভালো হয়।

উত্তর : দোকান বা ঘর ভাড়া নেয়ার পর ভাড়াগ্রহীতার জন্য সে দোকান বা ঘর অন্যত্র ভাড়া দেয়া জায়েয আছে। যদিও সে তার উপর ধার্যকৃত ভাড়ার চেয়ে কম বা বেশি গ্রহণ করে।

সুতরাং আপনার জন্য উক্ত দোকান ৪ হাজার টাকায় ভাড়া নেয়ার পর অন্যত্র ৬ হাজার টাকায় ভাড়া দেয়া জায়েয হবে এবং অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা আপনার জন্য হালাল হবে। (আল-মুহায্যাব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফিয়ী ১/৪০৩, আল-মাজমূউ শরহুল মুহায্যাব লিন-নববী আশ-শাফিয়ী ১৫/৫৯, আল-মুগনী লি-ইবনে কুদামা আল-হাম্বলী ৫/৩৫৪, আল-কাফী ফী ফিকহিল ইমাম আহমাদ ২/১৮৩, আল-ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ ৩/১২৫-১২৯, মুরশিদুল হাইরান ইলা মা'রিফাতি আহওয়ালিল ইনসান লি-মুহাম্মাদ কুদরী বাশ আল-হানাফী; পৃষ্ঠা ৮৬)

মুহাম্মাদ আবূ সাঈদ
মিরপুর-১৪, ঢাকা

৩৬৫ প্রশ্ন : বড় কোন প্রতিষ্ঠান যেমন বড় মসজিদ বা মাদরাসা, যার আর্থিক ফান্ড অনেক বড়, এ ধরনের বড় প্রতিষ্ঠানের টাকা ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা ফান্ডে রেখে লভ্যাংশ গ্রহণ করে তা মসজিদ বা মাদরাসায় খরচ করা যাবে কি? দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ

তা'আলা আপনাদের ভরপুর কামিয়াবী দান করুন।

উত্তর : বর্তমানে ইসলামী-অনৈসলামী, সরকারি-বেসরকারি যত ধরনের ব্যাংক প্রচলিত আছে, আমাদের জানামতে সব ব্যাংক প্রতিষ্ঠানই সুদী কারবারের সাথে জড়িত। কাগজে কলমে 'ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত' লেখা থাকলেও বাস্তবে এর বিপরীতটাই বেশি হয়। অতএব, ব্যক্তিগত বা বড়-ছোট কোন প্রতিষ্ঠানের টাকা যে কোন ব্যাংকের মুদারাবা ফান্ডে রেখে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। হিফাযতের জন্য ব্যাংকে টাকা রাখতে চাইলে কারেন্ট একাউন্টে রাখার অনুমতি আছে। কারেন্ট একাউন্ট খোলার সুযোগ থাকতে মুদারাবা একাউন্ট খোলার অনুমতি নেই। কারণ এতে লভ্যাংশের নামে সুদ গ্রহণের কাজে জড়াতে হয়। অথচ শরীয়ত মতে সুদ যেমন পরিহার করা জরুরী তেমনিভাবে সুদের সন্দেহ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী।

মসজিদ-মাদরাসার টাকা উন্নয়নের কোন প্রকল্পে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মাসআলা হলো, দাতাগণের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। নির্দিষ্ট খাতের জন্য দিয়ে থাকলে অনুমতি ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার করা যাবে না। এমনিভাবে সাধারণ ফান্ডের টাকা মুদারাবা, ব্যবসা বা অন্য কোন লাভজনক খাতে ব্যয় করতে হলেও দাতাগণের অনুমতি আবশ্যক। অনুমতি ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করলে লোকসান হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনুমতিক্রমে হলে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক নয়।

মসজিদ-মাদরাসার সাধারণ দাতাগণ টাকা-পয়সা দান করেন প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যয় করার জন্য, ব্যবসার জন্য নয়। কাজেই জনসাধারণের অনুদান ব্যবসায় খাটানো জায়েয নেই। (সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮, সুনানে বাইহাকী; হা.নং ১১৫০৫, ফাতাওয়া শামী ৪/৪৪৫, ৩৪৩, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২৫৯, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ১৬৩, কিতাবুল ফাতাওয়া ১০/৫৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/১৫৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/১১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/১২৫)

মাওলানা সালমান
মফিজবাগ হাউজিং, আদাবর, ঢাকা

৩৬৬ প্রশ্ন : বিকাশ, রকেট বা মোবাইল ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময় ক্যাশব্যাক অফার দিয়ে থাকে। যেমন নির্ধারিত কিছু দোকান থেকে ক্রয় করলে ৩০% বা কম-বেশি ক্যাশব্যাক দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, কোম্পানির পক্ষ থেকে যে টাকা ক্যাশব্যাক হিসেবে দেয় তা আমাদের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি আছে কি না? দলীলসহ বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : বিকাশ, রকেট বা মোবাইল কোম্পানির অফার যদি দোকানদারের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে উক্ত ক্যাশব্যাকের অফার দোকানদারের পণ্যের দাম কম রাখা হিসেবে কাস্টমার তা গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি বিকাশ বা রকেট তথা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহলে সেখানে সুদের প্রবল আশঙ্কা আছে। কেননা মোবাইলে পেমেন্ট করতে হলে প্রথমে আপনার মোবাইলে ক্যাশইন করা থাকতে হবে; শরীয়ত মতে যা করযের অন্তর্ভুক্ত। এর উপরে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত ক্যাশব্যাক গ্রহণ করা করয দিয়ে সুবিধা গ্রহণ করার নামান্তর– যাকে শরীয়ত সুদ আখ্যা দিয়েছে। সুতরাং যেখানে মোবাইল থেকে পেমেন্ট করলে ক্যাশব্যাক পাওয়া যায় সেখানে মোবাইলে পেমেন্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। (এ'লাউস সুনান ৪/৫০১, ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৬, ৩৫০, আল-হিদায়া ৩/৭৫, ৭৯)

উম্মে আব্দুল মালেক
স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৬৭ প্রশ্ন : হাদীসের বর্ণনামতে 'যে মদীনাকে বাসস্থানরূপে গ্রহণ করেছে এবং এখানকার মুসীবতে ধৈর্যধারণ করেছে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো'।

অন্য এক হাদীসের বর্ণনামতে 'যার জন্য সম্ভব হয় সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে। কারণ, যে এখানে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো'।

সাহাবায়ে কেরামও মদীনায় মৃত্যুবরণের দু'আ করতেন এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমার মতো সাধারণ মুসলমান সেখানে বসবাসের ইচ্ছা করলে কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে সহজ হবে এবং বরকতময় হবে?

উত্তর : প্রত্যেক মুমিনের কামনা এবং বাসনা এমন হওয়া উচিত যে, তার জীবনের শেষভাগ মদীনায় কাটাবে এবং সেই পবিত্র ভূমিকে নিজের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করবে। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীমে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রশ্নে উল্লিখিত সূরতে আপনার জন্য করণীয় হলো, আপনি যদি সামর্থ্যবান হন, তাহলে কোন মাহরাম সাথে নিয়ে মদীনায় বসবাস করার চেষ্টা করা। আর সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বিভিন্ন হাদীসে এর উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যদি আর্থিক সমস্যার কারণে বা রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে মদীনায় বসবাস করতে সক্ষম না হন, তাহলে নিজ বাসস্থানে থেকে মদীনাওয়ালা নবীজীর সাথে ভালোবাসা পয়দা করা ও সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও বুযুর্গানে দীনের আমল এমনই ছিলো।

বি.দ্র. বর্তমানে সৌদি সরকার মোটা অংক বা বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিত্তিতে সৌদিতে স্থায়ী নাগরিক হওয়ার সুবিধা দিচ্ছে, সেটাও জেনে দেখতে পারেন। কোনোটা আপনার দ্বারা সম্ভব কি না? (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩৭৮, মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ৩৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৯১৭, হিসনুল হাসীন; পৃষ্ঠা ২৬৮)

আহলে শূরা, মাক্কী মাসজিদ
কাৎসুশিকা, টোকিও, জাপান

৩৬৮ প্রশ্ন : আমরা জাপানের টোকিওতে বসবাস করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অমুসলিম দেশেও একটি দীনী মারকাযের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাওফীক দান করেছেন; আলহামদুলিল্লাহ।

মসজিদটি তাবলীগী মারকায হওয়ায় বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের উপস্থিতি এখানে অন্য অনেক মসজিদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি, যা জাপানের পরিবেশে চোখে পড়ার মতো। একটি অমুসলিম দেশে মুসলমানদের এভাবে একত্রিত হওয়ার বিষয়টা নিউজিল্যান্ডে মসজিদে আক্রমণের পর থেকে অনেকের ভিতর এক প্রকার ভীতি কাজ করছে। তাছাড়া মসজিদের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে বিষয়টি আরো প্রবল আকার ধারণ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে সিসি ক্যামেরা লাগানো শরীয়ত সম্মত কি না জানার জন্য দরখাস্ত করছি।

উত্তর : এটা হারাম হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্নোক্ত বিবরণানুযায়ী নিরাপত্তার প্রয়োজনে আপনাদের জন্য মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে সিসি ক্যামেরা লাগানোতে কোন সমস্যা নেই। (সূরা তালাক- ২-৩, মিশকাতুল মাসাবীহ; হা.নং ৪৪৯৭, শরহুস সিয়ারিল কাবীর ৪/২১৮, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ২৫১, ২৫২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/১৬৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৬/৪৮২)

মুহাম্মাদ আল-আমীন
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

৩৬৯ প্রশ্ন : বর্তমানে যে ইলেক্ট্রিক ব্যাটের সাহায্যে মশা মারা হয়, এ বিষয়টিকে শরীয়ত কতটুকু সমর্থন করে?

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে হত্যা করা জায়েয নেই; তবে আগুন ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে মারা সম্ভব না হলে এবং সেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হলে ভিন্ন কথা। ইলেক্ট্রিক ব্যাটে মশা প্রথমে বিদ্যুতের শক খেয়ে মারা যায়, এরপর বিদ্যুতের শিখায় জ্বলে যায়। তাই উক্ত ব্যাট দিয়ে মশা মারা জায়েয আছে এবং এটা আগুন দিয়ে প্রাণীকে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তথাপি মশা মারার অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে এ ধরনের ব্যাট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উত্তম। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৭, ফাতাওয়া শামী ৪/১৪০, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৮৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/৪১৮, ৪১৯)

হাজী আবূ তাহের
সেক্রেটারি, বসিলা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৭০ প্রশ্ন : আমাদের বসিলায় সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, যার সদস্য/ঘর সংখ্যা প্রায় ১২৫টি। সকলের উপর কুরবানী ফরয হলেও এদের মধ্যে কুরবানী দেন মাত্র ২৫-৩০ ঘর। উক্ত ঘরের কুরবানীর গোশত উঠিয়ে কুরবানী না দেয়া ঘরে পাঠানো হয়। এখন জানার বিষয় হলো-

(ক) কুরবানীদাতার সন্তুষ্টি ছাড়া সমাজ কর্তৃপক্ষ বাধ্যবাধকতার সাথে এই গোশত নিয়ে ঐ সকল পরিবারে বণ্টন করেন যারা কুরবানী করেননি। যদি কুরবানীদাতা সমাজে গোশত না দেন তাহলে তাকে উক্ত সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়। সমাজ কর্তৃপক্ষের এরূপ পদ্ধতি সঠিক কি না?

এই গোশত বণ্টনের কাজ যারা করে পারিশ্রমিক হিসেবে তাদেরকে একটি ভাগ দেয়া হয়। এটা কি সহীহ আছে?

(খ) এলাকায় প্রতিটি বালেগ মুসল্লির প্রতি বছরে পঞ্চাশ টাকা ইমামের বেতন ধার্য করা আছে যা কুরবানীর দিন পরিশোধ করে গোশত নিতে হয়। এই টাকা গোশতের বিনিময় হচ্ছে কি না?

(গ) আমাদের মহল্লার প্রতিটি ঘরে ইমাম সাহেব পালাক্রমে খানা খান। এই গোশত বণ্টন পদ্ধতি বন্ধ করতে চাইলে মহল্লার অনেকের দাবী, আমরা তাহলে ইমাম সাহেবকে খানা খাওয়াবো না। তাদের এই খানা খাওয়ানোটা গোশতের বিনিময় হচ্ছে কি না? এবং ইমাম সাহেবকে এভাবে মহল্লার সকলের বাড়িতে খানা খাওয়ানো ঠিক হচ্ছে কি না?

উত্তর : (ক) কুরবানীর গোশত সদকা করা বা হাদিয়া দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং কুরবানীদাতার একান্ত ব্যক্তিগত একটি বিষয়, এতে অন্য কারো জোর জবরদস্তির কোন সুযোগ নেই। যদি সামাজিকভাবে নিয়ম তৈরি করে গোশত নিয়ে সমাজে বণ্টনের প্রথা বানিয়ে নেয়া হয় তাহলে তা ঐচ্ছিক ও ব্যক্তিগত বিষয় থাকে না, সামাজিক নিয়মের কারণে বাধ্য হয়ে সেখানে গোশত পাঠানো হয়, ফলে এভাবে গৃহীত গোশত ধনী-গরীব কারো জন্য হালাল হয় না। কেননা কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে ভোগ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (অর্থ:) হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। (সূরা নিসা- ২৯)

আর হাদীসে পাকে এসেছে, (অর্থ:) কোন মুসলমানের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্যের জন্য হালাল হবে না। (সুনানে দারাকুতনী ৩/৪২৪)

তাই সমাজের উক্ত ব্যবস্থাপনা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

তবে হ্যাঁ, কোন সমাজে যদি প্রচলিত এ পদ্ধতির পরিবর্তে এমন নিয়ম করা হয় যে, স্বপ্রণোদিত হয়ে যার যতটুকু ইচ্ছা এক জায়গায় একত্র করবে, অতঃপর সে গোশত শুধু গরীবদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা করবে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। চাই তা শরীকদের পরস্পরে বণ্টনের পর হোক কিংবা সকলের সম্মতিক্রমে বণ্টনের পূর্বে হোক।

আর কুরবানীর গোশতের মাধ্যমে কোন কাজের এমনকি কসাইয়ের মজুরীও দেয়া জায়েয নেই। অতএব আপনাদের উক্ত কাজ তথা গোশত বণ্টনের বিনিময়ে কুরবানীর গোশত দেয়া কোন ক্রমেই জায়েয হবে না। (সূরা নিসা- ২৯, সুনানে দারাকুতনী ৩/৪২৪, আল-বাহরুর রায়িক ৮/২০৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৮০)

(খ) মসজিদ সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল মুসলমানের দায়িত্ব হলো, ইমাম সাহেবের উপযুক্ত বেতন এবং খাবারের ব্যবস্থা করা বা তার খরচ দিয়ে দেয়া। আর মহল্লাবাসীর উক্ত কথা অর্থাৎ গোশত বণ্টন বন্ধ হলে আমরা ইমাম সাহেবকে খানা খাওয়াবো না এ কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ গোশত দেয়া হোক বা না হোক ইমাম সাহেবের বেতন ভাতা ও খাবারের ব্যবস্থা করা সর্বাবস্থায় মসজিদে সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসল্লীদের জন্য জরুরী। অতএব গোশত বণ্টন ও ইমাম সাহেবকে খানা খাওয়ানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। একটাকে অন্যটার সাথে জড়ানোর কোন অবকাশ নেই। মসজিদের চাঁদা কখনোই কুরবানীর গোশতের বিনিময় হবে না।

তাছাড়া এলাকাবাসীদের জন্য ইমাম সাহেবকে খানা খাওয়াতে পারা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা উচিত। কারণ তারাই বর্তমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস এবং দীনের ধারক-বাহক। আর ইমাম সাহেবেরও নিজ সম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে দীনী খিদমত আঞ্জাম দেয়া উচিত। সমাজের এ ধরনের প্রচলিত সকল ভুল প্রথার সংশোধনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরী, যদিও বাহ্যিকভাবে তাতে তার কোন স্বার্থহানির আশঙ্কা থাকে। (আল-বাহরুর রায়িক ৩/৬৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৩৮৭)

রূহুল কায়েস

৩৭১ প্রশ্ন : হালাল খানা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিধান জানালে উপকৃতহ হবো–

আমেরিকার বাজারে গোশতের কোম্পানিগুলো হালাল নামে যে গরু/খাশী/মুরগীর গোশত বিক্রি করে, এগুলোর জবাই দুইভাবে করা হয় এবং প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে কিভাবে জবাই করা হয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

(১) শুধু লেখা থাকে, 'অটোমেটিক মেশিনে জবাই করা হালাল।' কিন্তু কিভাবে হালাল সেটার বর্ণনা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলার দুটো

সূরত অবলম্বন করা হয়। (ক) যে ব্যক্তি মেশিন কন্ট্রোল করে, সে মুসলিম এবং মেশিন চালু করার সময় সে একবার বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে। (খ) যে ব্যক্তি মেশিন কন্ট্রোল করে সে অমুসলিম; কিন্তু মুসলিম আরেকজন কর্মী থাকে, যে মেশিন চালু হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে।

(২) শুধু লেখা থাকে 'হাতে জবাই করা হালাল।' এক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে, যে ব্যক্তি হাতে জবাই করেছে সে মুসলিম কি না এবং মুসলিম হলেও প্রতিবার জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে কি না। এখানে জানার বিষয় হলো–

(ক) উপরোক্ত ১ নম্বরে বর্ণিত দুই সূরতের কোনটি খাওয়া হালাল? উভয় সূরতে যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলছে সে যদি অমুসলিম হয় তাহলে সেটা খাওয়া হালাল কি না?

(খ) হাতে জবাইকারী ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় কিন্তু প্রতিবার জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে কিনা এটা নিশ্চিতভাবে জানা নেই; আশঙ্কা আছে যে, প্রতিবার নাও বলতে পারে, তাহলে হালাল কি না? আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে সে যদি অমুসলিম হয়, তাহলে সেটা খাওয়ার বিধান কী?

(গ) এগুলোর যে প্রকারটি হালাল নয়, সেটা খাওয়া হলে কি রকম ক্ষতি? আমরা শুনে থাকি ৪০দিন পর্যন্ত দু'আ/ইবাদত কবুল হয় না– এ কথাটি কতটুকু সহীহ?

(ঘ) অমুসলিম কোন ব্যক্তি যদি খানার দাওয়াত দেয় (খানার প্রকার হালাল, যেমন- মাছ, সবজি ইত্যাদি) কিন্তু রান্না করেছে অমুসলিম, সেখানে খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : (ক) ১ নম্বরের (ক)-এ উল্লিখিত পন্থায় মেশিনের এক চাপে যতগুলো হালাল পশু জবাই হবে সেগুলোর গোশত খাওয়া জায়েয। পরবর্তী চাপে (যে চাপে বিসমিল্লাহ পড়া হয় না) জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

১ নম্বরের (খ)-এ উল্লিখিত পন্থায় মেশিনে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয নেই। আর যদি উভয় সূরতে যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলছে সে অমুসলিম হলে সেটাও খাওয়া হালাল নয়।

(খ) হাতে যবাইকারী ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় এবং এটা জানা থাকে যে, সে জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে তার দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল, যদিও প্রতিবার জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তেমনিভাবে কোন মুসলমানের ক্ষেত্রেও যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সে বিসমিল্লাহ পড়েনি, তাহলে সে জবাইয়ের গোশতও হালাল হবে না। আর যদি বিসমিল্লাহ বলনেওয়ালা ব্যক্তি অমুসলিম হয়, তাহলে সেটাও খাওয়া হালাল নয়।

(গ) আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মুমিনদেরকে হালাল খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে হারাম ভক্ষণকারীর ব্যাপারে অনেক শাস্তি ও ধমকি এসেছে। মুসলিম শরীফের ১০১৫ নম্বর হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা হারাম ভক্ষণকারীর দু'আ কবুল করেন না। তবে কতদিন কবুল করেন না, সে ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ নেই। এমনিভাবে ইমাম বাইহাকী রহ.-এর শু'আবুল ঈমান-এর ৫৪২০ নম্বর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই গোশত ও রক্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা গঠিত হয়েছে। আর ইবাদত কবুল না হওয়ার বিষয়টি হুবহু না পাওয়া গেলেও তার সমার্থবোধক হাদীস পাওয়া যায়। তাই হারাম থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা উচিত।

(ঘ) অমুসলিম কোন ব্যক্তি যদি খানার দাওয়াত দেয় এবং খানার প্রকার হালাল হয়, সাথে সাথে অমুসলিম রান্নাকারী তাতে হারাম কিছুর মিশ্রণ না ঘটায় মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে তার দাওয়াত খাওয়া জায়েয।

(সূরা আন'আম- ১২১, সূরা হজ্জ- ৩৪, সূরা মায়িদা- ৩, সূরা বাকারা- ১৭২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮২৬, ৫৪৯৮, মুয়াত্তা মালেক; হা.নং ১০১৬, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ২/৩৫, ৩২৮, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী ৭/৫০৪, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা ২/২৬, ৯১-৯৪, আওজাযুল মাসালিক ১০/১২-১৩)

মাওলানা নাজমুস সা'আদাহ শামীম
উত্তর কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

৩৭২ প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে। পরবর্তীতে তার দাওয়াতে তার বড় ভাই ও বাবা ইসলাম গ্রহণ করলেও তার মা ও দুই বিবাহিতা বোন এখনো হিন্দু রয়ে গেছে। বর্তমানে আমার বন্ধু এক মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে প্রবাসে আছে এবং তার মা ও বোনদের সাথে সে পূর্বের ন্যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে। কিন্তু বিধর্মী মা-বোনের সাথে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখাটা তার বিবি মেনে নিতে পারছে না।

জানার বিষয় হলো, বিধর্মী মা ও বোনদের সাথে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর জন্য কতটুকু বৈধ? আর এমন বিধর্মী মা ও বোনদের সাথে আমার বন্ধু ও তার স্ত্রীর জন্য কী ধরণের সম্পর্ক রাখতে ইসলাম নির্দেশ দেয় এবং কী ধরনের সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে বলে? মেহেরবানী করে সবিস্তারে উদ্ধৃতিসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তে মায়ের হক আদায়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী অমুসলিম মায়ের দুনিয়াবী হক আদায়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তার হক নষ্ট করা বা হক আদায়ে কার্পণ্য করা কোনভাবেই জায়েয হবে না। তার প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে। খোঁজ-খবর নিতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য করবে। তাদের হিদায়াতের জন্য চেষ্টা ও দু'আ করতে থাকবে। অনুরূপভাবে অমুসলিম বোনের দুনিয়াবী হকের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তার হক নষ্ট করা ঠিক হবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করবে। খোঁজ-খবর নিবে। তাদের বিপদ-আপদে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে।

উল্লেখ্য, তাদের দুনিয়াবী হক আদায় করতে গিয়ে নিজের দীনী ঝুঁকি গ্রহণ করা কোনভাবেই জায়েয হবে না। অর্থাৎ তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা নিজের দীনদারী ঝুঁকিমুক্ত থাকা পর্যন্ত সীমিত রাখতে হবে।

উপরন্তু আপনার বন্ধুর জন্য করণীয় হলো, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের হিদায়াতের দু'আ করা এবং সম্মান ও আদবের প্রতি খেয়াল রেখে নম্রতা ও হিকমতের সাথে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা। প্রয়োজনে এ কাজে মায়ের কাছের বিশ্বস্ত কোন লোকের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। (সূরা লুকমান- ১৫, সূরা মারইয়াম- ৪২, সহীহ বুখারী ৩/১৬৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৪৮, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৮/৬৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/১০৬)

মুহাম্মাদ মু'আয বিন খলীল
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৭৩ প্রশ্ন : (ক) আমাদের এলাকার এক মসজিদের ইমাম সাহেব মওদুদীর আকীদা পোষণ করে। এই বিষয়টি

আমরা কিছুদিন পূর্বে জানতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন হলো, না জানা অবস্থায় তার পিছনে যত নামায পড়েছি তা কি পুনরায় পড়তে হবে?

(খ) আমাদের মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত অনেক অশুদ্ধ। লাহনে জলী পড়েন। সেখানে শুধু একজন লোক আছেন যার তিলাওয়াতে লাহনে জলী নেই। জানার বিষয় হলো, যাদের তিলাওয়াত শুদ্ধ এবং যাদের তিলাওয়াত অশুদ্ধ, তাদের কারো জন্য কি ঐ ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয আছে? যদি জায়েয না থাকে, তাহলে যখন অন্য মসজিদে যাওয়া সম্ভবপর না হয়, তখন কি ঘরে নামায পড়ে নেয়া যাবে?

উত্তর : (ক) হক্কানী উলামায়ে কেরামের মতে মওদুদী মতবাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত একটি ভ্রান্ত দল। তারা নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে এবং সাহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে মান্য করে করে না। যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে তারা ফাসেক। আর ফাসেকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে ঐ ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ। তবে না জানা অবস্থায় তার পিছনে যত নামায পড়া হয়েছে সেগুলো পুনরায় পড়তে হবে না।

আর মসজিদ কমিটির উপর আবশ্যক হলো, এরূপ ইমামকে পরিবর্তন করে, বিশুদ্ধ আকীদার ইমাম নিয়োগ দেয়া। মসজিদ কমিটি উক্ত ইমামকে পরিবর্তন করতে সম্মত না হলে উক্ত কমিটিকে ভেঙ্গে নতুন অভিজ্ঞ ও দীনদার কমিটি গঠন করতে চেষ্টা করা মুসল্লীদের ঈমানী দায়িত্ব। (বাদাইয়েউস সানায়ে ১/৬৬৮, গুনইয়াতুল মুতামাল্লা ফী শরহি মুনইয়াতুল মুসাল্লা; পৃষ্ঠা ৫১৩-৫১৪, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩২৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/১৭২)

(খ) উক্ত ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত যদি এমন হয়, যার দ্বারা অর্থের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন হয় না, তাহলে নামায ভাঙবে না এবং ঐ ইমামের পিছনে সবাই ইকতিদা করতে পারবে। আর যদি তার তিলাওয়াত এত অশুদ্ধ হয়, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে এবং যাদের তিলাওয়াত শুদ্ধ তাদের ইকতিদা তার পিছনে জায়েয নেই। তবে যাদের তিলাওয়াত অশুদ্ধ তার পিছনে তাদের ইকতিদা সহীহ হবে।

এরূপ ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটির উচিত হলো, ঐ ইমামকে পরিবর্তন করে, নামাযের মাসআলা-মাসাইল ভালো জানে এবং তিলাওয়াত বিশুদ্ধ এমন লোককে নিয়োগ দেয়া। আর মসজিদ কমিটি যদি ঐ ইমামকে পরিবর্তন করতে সম্মত না হয় তাহলে সে অন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করবে। আর যদি অন্য মসজিদে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য ঘরে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাআতে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৮, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৯৫, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৮৮, কাওয়াইদুত তাজবীদ আলা রিওয়ায়াতি হাফস আন আসিম; পৃষ্ঠা ৪৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪০৭, ইমদাদুল আহকাম ১/৪৯৯)

উম্মে আব্দুল জব্বার
স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৭৪ প্রশ্ন : শরীয়তের বিধানমতে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক একজন মুসলিম নর-নারীকে জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পেতে সাহায্য করে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ভাষ্য অনুযায়ী পিতা-মাতার আপন ভাই-বোনদের সন্তান অর্থাৎ চাচাতো/ ফুফাতো/ মামাতো (যারা আপন চাচা, ফুফু, মামা, খালার সন্তান) ভাই-বোনদের বিবাহ তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ হিসেবে বলা হয়, যদি একটি নির্দিষ্ট রোগের বাহক 'জিন' শুধু পিতা অথবা মাতার মাধ্যমে সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে তা সন্তানের দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকবে বা প্রকাশ পাবে না বা সন্তানের ওই রোগটি হবে না। কিন্তু রোগটির জিন পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমেই সন্তানের দেহে প্রবেশ করলে (যা ৯৯% সময়ে নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের কারণেই হয়ে থাকে) সন্তানের ওই রোগটি হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি প্রাণঘাতীও হতে পারে। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়েতে সন্তানের প্রাণঘাতী রোগ হওয়ার আশঙ্কা অতিমাত্রায় বেড়ে যায়।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর এমন সকল কাজই ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু যদি নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ ক্ষতিকর হয়, তাহলে ইসলামের কোন বিধানে তা উল্লিখিত নেই কেন? ইসলাম তো বরং চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে অর্থাৎ হারাম তো নয়ই; বরং হালাল কাজ। বিষয়টির সঠিক সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : আপনি যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতামতটি উল্লেখ করেছেন, তার যথার্থতা কতটুকু? যদি শুধু তা গবেষণা হয়ে থাকে; কোন বাস্তবতা না থাকে, তাহলে এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ, এদের পরবর্তী গবেষণা পূর্ববর্তী অনেক গবেষণাকে বাতিল করে দেয়। যেহেতু তাদের গবেষণা ধারণাপ্রসূত, তাই সেগুলো অকাট্য নয় যে, তা পরিবর্তন হবে না। উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে ডি.এন.এ তথা জিন পুরোপুরি মিলে আপন জমজ দুইভাই বা ভাই-বোনের মধ্যে। তারা পরস্পরে বিয়ে-শাদী করলে তাদের বাচ্চাদের সেই প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে। আর ইসলামী শরীয়ত তাদের পরস্পরের বিবাহ হারাম করে দিয়েছে। থাকলো, তাদের ছেলে-মেয়ের পরস্পরে বিবাহ দেয়া তথা মামাতো, ফুফাতো ভাই-বোনদের বিবাহ– তো সেখানে কিছু ডি.এন.এ তথা জিনের মিল থাকতে পারে, যা তেমন ক্ষতিকারক নয়। আর যদি এই গবেষণার বাস্তবতা থেকেও থাকে, তাহলে এমন লোক পাওয়া যাবে যাদের পিতা-মাতা পরস্পরে আপন চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোন না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সেই প্রাণঘাতী রোগ হয়েছে।

মূল কথা হলো, রোগ দেয়ার মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ চাইলে কোন কারণ ছাড়াই রোগ-ব্যাধি দিতে পারেন। আবার চাইলে কারণ থাকা সত্ত্বেও রোগমুক্ত রাখতে পারেন। ইসলাম এ বিষয়ের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামে কোন ছোঁয়াচ নেই। অর্থাৎ কোন রোগের রোগ তৈরি করার ক্ষমতা নেই। প্রথমে যার রোগটা হয়েছে তাকে কে রোগ দিয়েছে? অতএব এ জাতীয় চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। কেউ যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ মতামতকে বিশ্বাস করে এটা মনে করে যে, ইসলাম এদের বিবাহ বৈধ করে ঠিক করেনি, তাহলে তার এ চিন্তা- চেতনা কুফরী চিন্তা-চেতনা। এর থেকে তওবা করা উচিত। যদি এ মতাদর্শ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব থেকে হিফাযত করুন। (সূরা মায়িদা- ৮৭, সূরা নাহল- ৯০, সহীহ বুখারী ৭/১২৬, ফাতহুল বারী ১০/১৬০, শরহু ফাতহিল কাদীর ৩/২০৮, ফাতাওয়া শামী ৩/২৮)

কিশোর প্রতিভা

নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী অর্থ আগামীতে কী হবে সে সম্পর্কে খবর দেয়া। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। আগামীকাল কী হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষ আন্দাজে অনুমানে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করে। তাদের সবই মিথ্যা হয়; দু-একটা কখনো সত্য মনে হয়। কিন্তু আমাদের নবীজী আল্লাহর কাছ থেকে জেনে জেনে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতো। নবীজীর দু-একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আজ তোমাদের বলব।

হযরত আলী রাযি.-এর শাহাদাত

হযরত আলী রাযি. বলেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আলী! আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা ঐ ব্যক্তি, যে তোমার মাথায় আঘাত করবে। আর রক্তে তোমার দাড়ি লাল হয়ে যাবে। সেই আঘাতে তুমি শহীদ হবে। প্রায় ৩০ বছর পর হযরত আলী রাযি. চতুর্থ খলীফা হলেন। তখনই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু সত্য হলো। হতভাগা ইবনে মুলযিম ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী রাযি.-এর মাথায় আঘাত করল এবং রক্তে তার দাড়ি লাল হয়ে গেল। আর সেই আঘাতেই তিনি শহীদ হলেন।

হযরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাত

হযরত উম্মুল ফযল রাযি. বলেন, আমি ফাতেমার পুত্র হুসাইনকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে দিলাম। হঠাৎ দেখি, তিনি কাঁদছেন। আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। নবীজী বললেন, আমার কলিজার টুকরাকে আমার উম্মতের লোকেরা শহীদ করবে। ফোরাত নদীর তীরে অনেক-কষ্ট-দিয়ে শহীদ করবে। পরবর্তীকালে তা-ই হলো। ইয়াযীদ বাহিনী কুফার কারবালায় ফোরাত নদীর তীরে হযরত হুসাইন রাযি.-কে বড় নির্দয়ভাবে শহীদ করল।

হযরত আবূ যর রাযি.-এর ইন্তিকাল

সাহাবী হযরত আবূ যর রাযি. এক নির্জন ভূমিতে বাস করতেন। একদিন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। তখন তার স্ত্রী খুব পেরেশান হয়ে কাঁদতে লাগলেন যে, স্বামীর কাফন-দাফন ও জানাযার কী ব্যবস্থা হবে! হযরত আবূ যর রাযি. স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি চিন্তা করো না, কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে বলেছেন যে, নির্জন ভূমিতে আমার মৃত্যু হবে। মুসলমানদের একটি জামাআত সেখানে উপস্থিত হবে। তারাই আমার জানাযার ব্যবস্থা করবে। আল্লাহর নবীর কথা মিথ্যা হতে পারে না। আমার মৃত্যুর পর তুমি রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করবে। অবশ্যই মুসলমানদের সেই জামাআত আসবে। হলো তা-ই। হযরত আবূ যর রাযি.-এর স্ত্রী রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মুসলমানদের একটি জামাআত সেখানে উপস্থিত হলো। তারা হযরত আবূ যর রাযি.-এর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

আগুনের ঘটনা

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হেজায ভূমিতে এক বিরাট আগুন আত্মপ্রকাশ করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কয়েকশো বছর পর ৬৫৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় সেই আগুন আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। সিরিয়া ও অন্যান্য শহর থেকে এবং সুদূর বসরা থেকেও অসংখ্য মানুষ আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়েছিল। মদীনার লোকেরা ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছে– জুমাদাল উখরা বুধবার রাতে মদীনায় হঠাৎ এক ভীষণ গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প শুরু হলো। তখন আমরা দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিরাট আগুন দেখতে পেলাম। চারিদিকে যেন আগুনের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে এবং বিরাট বিরাট স্ফুলিঙ্গ ছোটাছুটি করছে। আমরা কিয়ামতের ভয়ে নবীজীর রওযায় হাজির হয়ে কান্নাকাটি ও তওবা-ইস্তিগফার শুরু করলাম। একমাস পরে আগুন যেমন এসেছিল তেমনি গায়েব হয়ে গেল। আগুন কিভাবে এলো আবার কিভাবে গায়েব হলো আমরা কিছুই জানি না। ছোট্ট বন্ধুরা! আমাদের প্রিয় নবীজী আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা এখনো প্রকাশ পায়নি; কিয়ামতের আগে সেগুলো অবশ্যই প্রকাশ পাবে, কোন সন্দেহ নেই।

মুসাম্মাৎ মাহমূদা
নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা

উস্তাদের মজাক বড় মজাদার

আমি যখন মাদরাসায় ভর্তি হই, বয়স তখন ছয় বছর। মকতবে আলিফ-বা পড়ি। একদিন উস্তাদজী আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে ডেকে নিলেন। চেয়ারের উপর দাঁড় করিয়ে বললেন, এতক্ষণ যা পড়ালাম, সবাইকে জোরে জোরে পড়াও। আমি নিশ্চিন্ত মনে কাঁপাকাপাঁ কণ্ঠে উস্তাদজীর মতো করেই পড়ালাম। উস্তাদজী অনেক খুশি হলেন। পকেট থেকে দুই টাকার একটা নোট বের করে বললেন, এটা তোমার উস্তাদী করার বেতন! জীবনের প্রথম সেই বেতন (?) পেয়ে কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম, বলে বোঝানো যাবে না। এখন হাজার হাজার দুই টাকা পরিমাণ বেতন পেয়েও অমন আনন্দ পাই না।

আমি তখন দাওরায়ে হাদীস পড়ি। কিন্তু ঠিকমতো দাড়িও ওঠেনি। গোঁফ একটু গজিয়েছে, কাটার মতো হয়নি। উস্তাদজী আমার দাড়ি নিয়ে বেশ মজা করেন। মাঝে মাঝে বলেন, সালাতুল হাজত পড়ে দোয়া করিস, না হয় পরে বহুত মুশকিল হয়ে যাবে। দাওরা তো শেষ করছিস, দাড়ির তো নাম গন্ধ নেই। আমিও হুযূরের কথায় আনন্দ পাই। কজনের ভাগ্যে জোটে উস্তাদের এমন মধুর মজাক!

প্রিয় উস্তাদজীদের এমন মধুর স্মৃতি স্মরণ করে এখনও পুলকিত হই। তাদের দু'আর বরকতেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে কুরআন হাদীসের ইলম অর্জনের তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমার সকল শফীক উস্তাদজীকে দুনিয়া-আখেরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

হুসাইন আহমাদ
মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

পূরণ হলো না বাবার স্বপ্ন

আমি তখন খুব ছোট। পড়ালেখা করানোর জন্য আব্বা স্কুলে নিয়ে গেলেন। প্রধান শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন। বললাম, তুষার শেখ। বললেন, এ নাম চলবে না; সুন্দর একটা নাম বলো। আব্বা বললেন, তাহলে সাইফুল ইসলাম রেখে দিন। স্কুলে ভর্তি হলাম। ক্লাস করছি। একসময় তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হলো। ছুটি চলছে। একদিন আব্বাকে দেখলাম আম্মাকে বলছেন, আমার একটা ছেলে যদি আলেম হতো! ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করতো! কবরের পাশে গিয়ে আমাদের জন্য দু'আ করতো! কিন্তু আমি কাউকে জোর করবো না, যে স্বেচ্ছায় পড়বে তাকেই আলেম বানাবো। ছুটি শেষ হলো। স্কুল খোলা। ক্লাস চলছে। একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললাম, আব্বা! আমার স্কুলে যেতে ভালো লাগে না; আমি মাদরাসায় পড়তে চাই। আব্বা যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টির দেখা পেলেন। দেরি না করে শার্ট-প্যান্ট-সহই আমাকে মাদরাসায় নিয়ে গেলেন। ভর্তি করে দিয়ে উস্তাদজীকে বললেন, হুযূর! আমার ইচ্ছা, ছেলেকে বড় আলেম বানাবো, কীভাবে হবে তা আমার জানা নেই; আপনাকে এ দায়িত্বভার অর্পণ করলাম। আপনি যেভাবে ভালো মনে করবেন, ওর পড়ালেখার ব্যবস্থা করবেন। পড়ালেখা ভালোই চলছিল। নাযেরা শেষ হলো। উর্দূ জামাআতও শেষ। রমযানের কয়েক দিন পর হুযূর আমাকে বললেন, এখন থেকে তুমি ঢাকায় পড়াশোনা করবে। আগামী সপ্তাহে তোমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বড় কোন মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেবো। সংবাদটি খুশির হলেও আমার জন্য ছিল খুবই কষ্টের। আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে কিভাবে ঢাকায় থাকবো! ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও উস্তাদজীর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। বাড়ি থেকে আসার সময় আমার দু'চোখ পানিতে ছলছল করছিল। আব্বাও কেমন ফ্যালফ্যাল চোখে দেখছিলেন। আসার সময় আব্বা শুধু বললেন, দেখো বাবা! ভালো করে পড়ালেখা করে আমার ইচ্ছেটা পূরণ করো। আমার স্বপ্ন হলো, তুমি আমার জানাযা পড়াবে। ঢাকায় চলে এলাম। কিছুদিন পর খবর আসল, আব্বা খুব অসুস্থ। দ্রুত বাড়িতে চলে আসলাম। এক সপ্তাহ বাড়িতে ছিলাম। আব্বার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল না। একপর্যায়ে আব্বা বললেন, তুমি মাদরাসায় চলে যাও, আমার যা তাকদীর আছে তাতো হবেই; তোমার পড়ালেখার যেন ক্ষতি না হয়! অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। ব্যাগ কাঁধে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হবো, এমন সময় পাশের কামরা থেকে আম্মার কান্নাধ্বনি শুনতে পেলাম। গিয়ে দেখি, আব্বা আখেরাতের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে আব্বার জানাযা পড়ানো হলো না। এটাই তাকদীর, হাজার চেষ্টা করেও যা লেখা নেই, মানুষ তা অর্জন করতে পারে না। এর পর থেকে ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর সবার আগে আব্বার কবরে যাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হল। আল্লাহরই ইচ্ছায় আব্বার প্রথম ইচ্ছা পূরণ হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ইচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ পূরণ করার চেষ্টা করছি। সবার কাছে দু'আ চাই, আব্বার শেষ ইচ্ছা পূরণ করে আমি যেন বড় আলেম হতে পারি, আলেমে বা-আমল হতে পারি এবং এই উসিলায় আমার আব্বার কবরটি যেন হয় জান্নাতের বাগান।

সাইফুল ইসলাম

জামি'আ ইলিয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা

সূরা ইয়াসীনের বরকত

২৫ জানুয়ারি ২০১৮ ইংরেজি। ফজরের নামায পড়ে জায়নামাযে বসেই সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করেছি। ১০/১৫ মিনিট পর আব্বু আমাকে ডেকে বললেন, চলো বাবা মাদরাসা থেকে ঘুরে আসি। আমি আব্বুর পিছনে পিছনে চলছি। একপর্যায়ে আমরা হাইওয়ের পাশে এসে দাঁড়ালাম। ডানে-বামে তাকালাম কোথাও অটোরিকশা দেখা যায় কিনা। কিছুক্ষণ পর একটি অটোরিকশা দেখা গেল। মনে হল, রিকশাচালক এইমাত্র রিকশা নিয়ে বের হয়েছেন। চোখে এখনও তন্দ্রাভাব স্পষ্ট। আমরা রিকশায় উঠে বসলাম। আব্বু রিকশাচালককে বললেন, রাস্তার রং-সাইড দিয়ে না গিয়ে তোমার সাইড দিয়ে যাও। আব্বুর কথা মত রিকশাচালক তার সাইড দিয়েই চলছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তাই ঘটে গেলো। রাস্তা পার হয়ে আমাদের বহনকারী রিকশাটি একটি ছোট ব্রিজে উঠতে যাবে, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে হর্ন বাজিয়ে দ্রুত গতিতে একটি বড় বাস এসে পড়ল। এসেই তার পেছনের অংশ রিকশার ডানদিকে লাগিয়ে চলে গেল। বাসের ধাক্কা রিকশা সামলামে কী করে! ব্যস রিকশাটি গজ দশেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আমার মনে হলো, মাথার উপর দিয়ে একটি প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ হলো। সাথে সাথেই আমার মাথার টুপি দশহাত দূরে গিয়ে পড়ল। আমি রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অপরদিকে রিকশার ব্যাটারিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। আব্বু আর রিকশাচালক উভয় রিকশার নিচে পড়ে রইলেন। আমি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, আরেকটি বাস উল্টোদিক থেকে খুব দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। আমি হাতের ইশারায় বাসটি থামিয়ে দিলাম। না হয় বাসচালক আমাদের সকলের উপর বাস উঠিয়ে দিয়ে চলে যেতো। আমি দ্রুত অগ্রসর হয়ে আব্বু ও রিকশাচালককে উঠালাম। আব্বু আমাকে দেখে বার বার বলতে লাগলেন, বাবা তোমার কিছু হয়নি তো? আমি বললাম, সকালে সূরা ইয়াসিন পড়েছি, হয়তো এরই বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। না হলে এই দুর্ঘটনায় আমাদের একজনের বাঁচার কথা নয়! আমি হাঁটুতে হালকা চোট পেয়েছি। আব্বা ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলে হালকা ব্যথা পেয়েছেন। আর রিকশাচালক প্রথমে অনেক ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হল, কিন্তু যখন দেখতে পেল আমাদের তেমন ক্ষতি হয়নি, তখন সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সে ভয় পাচ্ছিল, আমাদের কিছু হলে তাকে না আবার পাকড়াও করা হয়!

আমরা মাদরাসায় না গিয়ে বাসায় ফিরে আসলাম। সবাইকে বললাম, দিনের শুরুতে তিলাওয়াতকৃত সূরা ইয়াসিনের বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

মাসুম বিল্লাহ

মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

হতভাগা সন্তান

পড়ন্ত বিকেল। সূর্যটা ডুবিডুবি করছে। পরিশ্রমক্লান্ত শহুরে মানুষ ঘরে ফিরছে। ক্লান্ত-বদন বিষণ্ন-মুখ এক বৃদ্ধ পথ চলছেন। মুখোমুখি হতে সালাম দিলাম। তিনি উত্তর দিয়ে হাঁটা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বলবেন চাচা? জিজ্ঞেস করলাম আমি। বললেন,

– শোন, তুই তো এখনও ছোট। যখন বড় হবি, তোর মা-বাপেরে ভালো কইরা দেখাশোনা করবি। তাগোর খোঁজ-খবর নিবি। তাগোরে কোনো সময় ভুলবি না। বুঝলি, সন্তান হইলো মা-বাপের কইলজা! মা-বাপের পরাণ! কইলজার দেয়া কষ্ট বড় কঠিন!

আমার প্রশ্নঘেরা চোখ দেখে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগলেন এক বেদনাবিধূর দাস্তান; তার হতভাগা পুত্রের হৃদয় বিদারক অসদাচরণ–

আমার একটামাত্র পোলা। বহু কষ্ট কইরা তারে মানুষ বানাইছি। খুব মেধাবী ছিল, সব ক্লাসে ফার্স্ট হইতো। তারে নিয়া বড় বড় স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, একদিন আমারও দিন ফিরবো, আরাম-আয়েশে থাকতে পারুম। তার পড়ালেখার লাইগা আমি আর ওর মা আমগোর রক্ত পানি করছি। বাড়ি-ভিটা ছাড়া সব জায়গা-জমি বেইচা তারে বিদেশে পড়নের খরচা দিছি। অহন সে ঢাকায় বড় চাকরি করে। বউ-পোলা লইয়া হেনেই থাকে। আমগো বুড়া-বুড়ীর খবর লয় না। সইতে না পাইরা গেল বছর ওর মা-ডাও মইরা গেছে। আমিও কমজোর হইয়া গেছি। আগে রিশকা চালায়া কোনমতে দিন চলতো। অহন শরীরেও শক্তি নাই, কামাই-রোজগারও করতে পারি না। মাস ছয়েক আগে বাড়ির ভিটাডাও বেইচা দিছি। ঐ বস্তিতে একটা ছাপড়া ভাড়া নিয়া কোনমতে মরণের অপেক্ষায় আছি।

তারপর চোখের পানি মুছতে মুছতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

– তুই কিন্তু বাবা এমন করিস না। মা-বাপরে কষ্ট দিলে তাগোর কইলজা ফাইটা যায়। মনে রাখিস, মা-বাপেরে কান্দায়া কেউ আরামে থাকতে পারে না।

স্বপ্নাহত এক বৃদ্ধের এই সকরুণ কাহিনী আমার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন বৃদ্ধের ছেলেকে হিদায়াত দেন এবং তার পিতার অনুগত করে দেন। পৃথিবীর আর কোন সন্তান যেন পিতা-মাতাকে না কাঁদায়। আমাকে এবং পৃথিবীর সকল সন্তানকে যেন মাতা-পিতার চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেন।

আহমদ ইবনে আমানত খান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

জীবনের হিসাব

আজও সূর্য উঠেছে প্রতিদিনের মতো। সূর্যের সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। গাছে গাছে ধ্বনিত হচ্ছে পাখিদের কলরব। মৃদুমন্দ বাতাস দেহ-মন সতেজ করে দিচ্ছে। রাতের জড়তা কাটিয়ে সকলেই আপন কাজে ব্যস্ত হবে। পাখিরা খাবারের খোঁজে দূর অজানায় ছুটে যাবে। মানুষ ছুটে চলবে আপন কর্মস্থলে। কিছু সময় পর সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

দ্বিপ্রহরের সূর্যটা তার প্রখর তেজ আর দীপ্তি ছড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে আজ মনটা তার ভীষণ খারাপ। কোন কারণে তার প্রচণ্ড গোস্‌সা হয়েছে। এই প্রচণ্ড খরতাপে সবাই পেরেশান। অনেকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবুও থেমে থাকেনি মানুষের পথচলা। সবাই আহারের সন্ধানে নিমগ্ন।

একসময় সূর্যতাপ মধ্য আকাশ থেকে পূর্ব দিকে ঢলে পড়ে। ধীর কদমে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে। তখন সূর্যের আর সেই তেজোদ্দীপ্ত প্রখরতা নেই। তখন তার ললাটে ধীরে ধীরে চিন্তার রেখা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ খুব অল্পক্ষণ পরেই সে বিদায় নিয়ে চলে যাবে আঁধার গহীনে। হারানো যৌবনের ব্যথায় তারপর কপোল-কপাল ঘর্মাক্ত। দিনের শেষ প্রহর; তার একটি দিনের শেষবেলা। মধ্যবেলার দাপুটে সূর্যটা এখন দেখলে মনে হয় না, তার তাপাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অনেকের দেহ। কারণ সে এখন ন্যুব্জ, বয়োবৃদ্ধ। চেহারায় অসামান্য মলিনতা। কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সে। দিবস নামক এ পৃথিবী ছেড়ে সে হারিয়ে যাবে রজনীর গহীন আঁধারে।

আমাদের জীবনটাও ঠিক সূর্যের মতো। প্রথমে মায়ের পেট, অতঃপর শৈশব, তারপর কৈশোর। যৌবনের হাওয়া লাগতেই দেহ-মনে অন্যরকম একটা ভাব ও ভাবনা কাজ করে। সবকিছুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ ন্যায়-অন্যায় আর সৎ-অসৎ-এর পার্থক্যটুকুও হারিয়ে ফেলে। কারণ শরীরের উষ্ণতা সবকিছুকে ছাপিয়ে পথ চলতে চায়।

একসময় এ তেজোদ্দীপ্ত যুবকই পৌঢ় হয়। শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। দাঁতগুলো আর আগের মত কাজ করে না। হাত-পায়ে এখন আর সেই চঞ্চলতা নেই। নেই চেহারার সেই জৌলুস। শেষ বয়সে মৃত্যুর প্রহর গোনা এই বৃদ্ধ কেমন যেন সূর্যের ন্যায় অনুতপ্ত। পড়ন্ত বেলায় জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একে একে মনের জানালায় উঁকি দেয়– কত দাপট ছিল তার! এক আঙ্গুলের ইশারায় কতো কিছুই ঘটে যেতো। কতো মানুষ তার ভয়ে ঘরে কপাট লাগিয়েছে, ইয়ত্তা নেই। তার কূটবুদ্ধিতে খালি হয়েছে কত মায়ের বুক। কিন্তু আজ সে বড়ই অসহায়। ঘরের আপনজনেরাও তার কথা তেমন গ্রাহ্য করে না। আরো কত কি...

আজকের দিনটি কেমন যেন আমাকে এ বার্তাই দিয়ে গেল– আগামীর প্রস্তুতি নাও। সময় একদম কম। তাই একটি দিন চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে একটি দিন ঝরে যাওয়া। সবাই বলে সন্তান বড় হচ্ছে; আসলে কি তাই? না, বরং জীবন থেকে একটি দিন চলে গেলো মানে, আমি আমার জীবন থেকে একটি দিন হারালাম, আমি ছোট হলাম। আফসোস! কিছুই তো অর্জন হল না। তাহলে আমার কী হবে?...

আমীরুল ইসলাম
মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া